প্রথম প্রহর

হুমায়ূন আহমেদ

আমার বয়স প্রায় বত্রিশ।

প্রায় বললাম এইজন্যে যে, মাসের হিসেবে একটু গণ্ডগোল আছে। আমার বাবার খাতাপত্রে লেখা আমার জন্ম ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখ। আমার মা নিজেও বলেন ডিসেম্বর। মা-বাবার কথাই এসব ক্ষেত্রে সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু আমার যেখানে জন্ম সেই নানার বাড়িতে সবাই জানে আমার জন্ম হয়েছে জানুয়ারির তিন তারিখ। পুরো একটা মাসের গণ্ডগোল।

আমার মায়ের কথায় আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই না। কারণ তিনি আমার বাবার সব কথাকেই অভ্রান্ত মনে করেন। বাবা যদি বলেন— না না, ফরিদের জন্ম এপ্রিল মাসে। ডিসেম্বর কে বলল ?— তাহলে প্রথম কিছুদিন মা কিছুই বলবেন না। তারপর বলবেন— হ্যাঁ, তাই তো, ওর জন্মের সময় তো গরমই ছিল। জানালা রাতে খোলা থাকত, স্পষ্ট মনে আছে।

এক মাসের তফাত এমন কিছু না। আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষেরই জন্মের দিন-তারিখে গণ্ডগোল আছে। তবু কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছে এক মাস খুব কমও নয়। আমার আয়ু যদি বত্রিশ বছর হয় তা হলে একমাস হচ্ছে আমার মোট জীবনের তিনশ' চুরাশি ভাগের এক ভাগ। অনেকটা সময়। তিরিশ দিন মানে হচ্ছে সাতশ' বিশ ঘণ্টা। আরো ছোট করে বললে, পঁচিশ লক্ষ সেকেন্ডেরও বেশি। খুব একটা হেলাফেলা করার মতো ব্যাপার না।

গত পনেরো দিন ধরেই এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমি ভাবছি। তুচ্ছ বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। কারণ গত পনেরো দিন ধরেই আমি হাসপাতালে ভর্তি হবার চেষ্টা করছি। ভর্তি হতে পারলেই তলপেটের ডুওডেন্যালের মুখে একটা অপারেশন হবে। কবুতরের ডিমের মতো একটা টিউমার ডাক্তাররা সারিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবেন।

টিউমারটি ম্যালিগনেন্ট কি-না তা আমাকে কেউ বলছে না। ডাক্তাররা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে শুধু বলছেন— আরে, এইসব নিয়ে আপনার এত চিন্তা কিসের ?

হাসপাতালে আগে ভর্তি হয়ে যান, তারপর দেখা যাবে। ডাক্তারের কাঁধ ঝাঁকুনিটা আমার ভালো লাগে নি। যেন খুব চেষ্টা করে ঝাঁকানো। এরচেয়েও সন্দেহজনক হচ্ছে— দ্বিতীয়বার যখন এক্স-রে রিপোর্ট নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম এবং ভিজিট দিতে গেলাম, তিনি অমায়িক ভঙ্গিতে হেসে বললেন— আরে, একবার তো ভিজিট দিয়েছেন, আবার কেন ?

ভিজিট নেয়ার ব্যাপারে কোনো ডাক্তার আপত্তি করেন বলে জানতাম না। ইনি এই বাড়তি দয়াটি কেন দেখাচ্ছেন ? কেন এই অনুগ্রহ ?

আপনি একটা সীট যোগাড় করেন। দি আরলিয়ার দি বেটার।

চেষ্টা তো করছি, পারছি না তো!

রোজ যাবেন। রোজ খোঁজ নেবেন।

আমি রোজ যাই। হেঁটে যাই। রিকশা করে ফিরি। ঘণ্টাখানিক সময় কাটে হাসপাতালে। খুব যে খারাপ কাটে তা না। অ্যাডমিশন সেকশনের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার খাতির হয়েছে। একজন হচ্ছে মতি ভাই। অসম্ভব রোগা মানুষ। সাধারণত রোগা মানুষেরা লম্বা হয়— মতি ভাই বেঁটে। তাঁর কাছে বসলেই তিনি নিচু গলায় অনবরত কথা বলেন। বিরক্তিতে কপাল কোঁচকান এবং কিছুক্ষণ পরপর দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচান। আমাকে দেখলেই চায়ের অর্ডার দিয়ে গলা নিচু করে বলেন, হবে হবে, ধৈর্য ধরেন।

আমি ধৈর্য ধরি। খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে ঘরে ফিরে এক মাসের হিসাব করি।

এক মাস হচ্ছে সাতশ বিশ ঘণ্টা। তেতাল্লিশ হাজার দুশ' মিনিট। পঁচিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার সেকেন্ড। দীর্ঘ সময়।

pathagar.net

আমার বন্ধুরা শেষপর্যন্ত একটা কেবিন যোগাড় করে ফেলল। কেবিন নাম্বার দু'শ এগারো। বন্ধুবান্ধবরা যোগাড় করল বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, করল মনসুর। বিয়ে করার পর তার কিছু নতুন যোগাযোগ হয়েছে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন, যে-কোনো কারণেই হোক, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষেদের চেনে। মনসুরের বিয়েতে একজন মেজর জেনারেল পর্যন্ত এসেছিলেন। মেজর জেনারেলদের চেহারা এমন সাধারণ হয় আমার জানা ছিল না। এরাও পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বিয়ে খেতে আসে এবং রোস্টের টুকরা বদলে দিতে বলে, দেখে আমি যথেষ্ট অবাক হয়েছিলাম। মনসুরের শ্বশুর তাঁকে 'তুই তুই' করে বলেছিলেন, সেও এক বিস্ময়।

আমার সীট যোগাড় করার ব্যাপারে এই ভদ্রলোকের হাত আছে বলে আমার ধারণা। মনসুর অবশ্য ভেঙে কিছু বলল না। শুধু বলল, খুব ভালো ঘর। দিন-রাত হাওয়া খেলে। ভাবটা এরকম যেন হোটেলের ঘর পছন্দ করছি। হাওয়া খেললে নেব, নয়তো নেব না। আমি বললাম, কবে যেতে হবে?

সোমবার। সোমবারে খালি হবে। যে আছে সে রিলিজ হয়ে যাবে।

জন্মের রিলিজ নাকি?

আরে না। অসুখ সেরে গেছে। এখন পেশেন্ট বাড়ি যাচ্ছে।

বলেই মনসুর গলা টেনে অনেকক্ষণ ধরে হাসল, যার মানে হচ্ছে পেশেন্টের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক নয়। পুরোপুরিই রিলিজড হয়ে অন্য কোথাও যাবে।

মনসুর বলল, তুই প্রিপারেশন নিয়ে নে।

কী প্রিপারেশন নেব?

কাপড়-টাপড় গুছিয়ে ফেল। থার্মোফ্লাস্ক আছে? নেই, না? একটা থার্মোফ্লাস্ক দরকার।

থার্মোফ্লাস্ক দিয়ে কী হবে?

চা-টা খাবি। বললেই এনে দেবে।

pathagar.net

মনসুর খুব উৎসাহ দেখাতে লাগল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটায় সে একটা উৎসব নিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। যেন খুব ফুর্তির ব্যাপার।

বড় স্যুটকেস আছে?

নাহ্।

হ্যান্ডব্যাগ তো আছে?

আছে বোধহয়। দেখ চৌকির নিচে।

মনসুর আমার সবুজ রঙের হ্যান্ডব্যাগ টেনে বের করল এবং তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করতে বসল। কিন্তু সোমবার এখনো অনেক দেরি, আজ মাত্র বুধবার এবং বুধবারও শেষ হয়ে যায় নি। সবে শুরু হয়েছে। এখন বাজছে দশটা। আমি বললাম, চা খাবি?

খাব। এই হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে যেতে পারবি না। হ্যান্ডেল-ফ্যান্ডেল নেই। আমি একটা নিয়ে আসব। থার্মোফ্লাস্কও আনব।

ঠিক আছে।

আর কী কী লাগবে বল, লিস্টি করে ফেলা যাক।

হাসপাতালে যেতে হলে কী কী নিতে হয় কে জানে! টুথপেস্ট এবং টুথব্রাশ এই দুটি জিনিস নিশ্চয়ই লাগে। টুথপেস্ট আছে। এ মাসের দু'তারিখেই কেনা হয়েছে। চিরুনি নিতে হয় নিশ্চয়ই। নাকি চিরুনি দিয়ে মাথা কেউ আঁচড়ায় না? রোগীদের এসব করতে নেই।

হাসপাতাল সম্পর্কে আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। প্রায় একযুগ আগে বড় আপা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেই যাওয়া ছিল উৎসবের যাওয়া। আমাদের মধ্যে দারুণ হৈ-চৈ ও উত্তেজনা। একটি প্রকাণ্ড স্যুটকেস ঠেসে বোঝাই করা হলো। সেখানে সকালে পরার শাড়ি, বিকেলে পরার শাড়ি, গায়ে মাখার পাউডার, পানের মসলা সবই আছে। বড় আপা ক্রমাগত কাঁদছে। আমাদের খুব ফুর্তি। সবাই হাসছি। আমি এবং আমার মেজো ভাই ছুটে গিয়ে বেবিট্যাক্সি নিয়ে এলাম। বড় আপা তার বিশাল পেট নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠল বেবিট্যাক্সিতে। বড় সুখের যাত্রা। আমার বাবা, যিনি প্রায় কোনো ব্যাপারেই উৎসাহ প্রকাশ করেন না, মুখ সবসময় আমশি করে রাখেন, তাঁকেও দেখা গেল হাতে সিগারেট নিয়ে হাসিমুখে কথা বলছেন। (কথা বলছেন মানে উপদেশ দিচ্ছেন। আমার বাবা উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন না হলে কথা বলেন না।) দুলাভাই লাজুক ভঙ্গিতে বড় আপার পাশে গিয়ে বসলেন। আমার মা বললেন, বজলু, তুমি বাঁ দিকে বসো। মা'র অনেক ডান-বামের ব্যাপার ছিল। দুলাভাই বাধ্য ছেলের মতো কথা শুনলেন। মা বেবিট্যাক্সিতে ওঠার আগে তিন মিনিট দাঁড়িয়ে লম্বা কী একটা

দোয়া পড়লেন। খুব সম্ভব সুরা আ'র রহমান। এই দোয়াটি তাঁর খুব পছন্দ। খুব নাকি কড়া দোয়া। খুব কাজের।

বিভিন্ন রকম দোয়া-দরুদ মা'র মুখস্থ। তাঁর কাছে এক কপি নেয়ামুল কুরআন আছে। এই গ্রন্থটিকে তিনি যাবতীয় সমস্যার সমাধান বলে মনে করেন। একবার তাঁর বালিশের নিচ থেকে আংটি চুরি হয়ে গেল। তাঁর মুখ হয়ে গেল মরা মানুষের মুখের মতো। দেখলাম, তিনি নেয়ামুল কুরআনের পাতা ওল্টাচ্ছেন। সেখানে নাকি হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার একটা দোয়া আছে। সারা দুপুর মা সেই দোয়া পড়লেন। মাঝারি সাইজের এক বালতি চোখের পানি ফেললেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে আংটি পাওয়া গেল। মা গম্ভীর গলায় বললেন, বিশ্বাস তো করিস না, দোয়ার মরতবা দেখলি ?

মা'র দোয়া অবশ্যি সবসময় কাজ করে না। কাজ করলে বড় আপা হাসপাতাল থেকে ফিরত। সে ফেরে নি। বারো-তেরো বৎসর আগের ব্যাপার। এখন আর সবকিছু পরিষ্কার মনে নেই।

কষ্টের ব্যাপারগুলো মানুষের ভালো মনে থাকে না। সে কখনো মনে রাখতে চায় না। কিন্তু সুখের ব্যাপার খুব ভালোভাবে মনে থাকে। কারণ এগুলো নিয়ে প্রায়ই ভাবা হয়। যেমন আমার মেজো ভাইয়ের জার্মানি যাওয়ার ব্যাপারটা। একদিন সন্ধ্যাবেলা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, সে জার্মানি যাচ্ছে।

বাবা প্রচণ্ড ধমক লাগালেন— কী বলছিস এসব ? জার্মানি যাচ্ছি মানে, ফাজলামো ?

বাবা বিদেশযাত্রার পক্ষপাতি নন এবং এজন্যই ধমকাচ্ছেন তা কিন্তু নয়। তিনি না ধমকে কথা বলতে পারেন না। পরবর্তী সময়ে আমি এর কারণ বের করেছিলাম। বাবার চাকরিটা ছিল ছোট। অফিসে সবাই তাঁকে ধমকাত। বাসায় এসে তা ভুলতে চেষ্টা করতেন। এবং প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে চেঁচাতেন। জার্মানির ব্যাপারেও তিনি চেঁচাতে শুরু করলেন।

পাখা উঠেছে ? জার্মানি— আমেরিকা ? টাকা দেবে কে ? গাছ থেকে আসবে ? বৃক্ষ থেকে আসবে ?

টাকা দিতে হবে না।

যাবি কীভাবে ? সাঁতার দিয়ে ? এ্যাঁ, সন্তরণ ?

মেজো ভাই থতমত খেয়ে বলল, টাকা ওরা দিচ্ছে। স্কলারশিপ।

আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। চিরকাল শুনে এসেছি, ওর ভাই বাইরে যাচ্ছে, ওর চাচা যাচ্ছে। মামা আমেরিকা থেকে জিনসের প্যান্ট পাঠিয়েছে। খালা জাপান থেকে হাওয়াই শার্ট পাঠিয়েছে। শুধু আমাদের এসব ব্যাপার কখনো ছিল

না। কাজেই মেজো ভাইয়ের ব্যাপারটা আমাদের কারোর বিশ্বাস হলো না। তবু একদিন সে বেমানান একটা কর্ডের কোট পরে সত্যি সত্যিই জার্মানি চলে গেল। এয়ারপোর্টে বাবা কেঁদেকেটে তার চারপাশে ভিড় জমিয়ে ফেললেন। আরো অনেকের আত্মীয়স্বজন যাচ্ছিল। তাদের হয়তো কাঁদার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাবার কান্না দেখে সবার চোখে পানি এলো। একজন অপরিচিত বয়স্ক লোক বাবাকে জড়িয়ে ধরে— কাঁদবেন না ভাই, কাঁদবেন না ভাই— বলে নিজেও বাবার মতো আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সেই ভদ্রলোক গাড়িতে করে আমাদের বাসায় পৌঁছে দিলেন। অনেক টাকা বেঁচে গেল। এয়ারপোর্ট থেকে ফার্মগেট। বাস ভাড়াই নেয় দুটাকা। আমরা এতগুলো মানুষ।

বাবার শোকের ভঙ্গি সবসময়ই এরকম। বড় আপার মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি যে গভীর দুঃখের প্রকাশ দেখিয়েছিলেন, জগতের আর কোনো বাবা এরকম দেখিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি অন্নজল স্পর্শ করেন নি। আমি সেদিন বাবার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।

বড় আপার প্রতি বাবার একটি আলাদা পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাকে তিনি কখনো ধমক দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। খুব ছোটবেলায় নাকি একটা চড় দিয়েছিলেন, এতেই বড় আপা কাঁদতে কাঁদতে বিছানা নেন এবং তাঁর টাইফয়েড হয়ে যায়। জীবনসংশয় যাকে বলে। ব্যাপারটা হাস্যকর। টাইফয়েড একটা জীবাণুঘটিত ব্যাপার। চড় দিয়ে কারোর টাইফয়েড বাঁধিয়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বাবাকে এসব কে বোঝাবে? টাইফয়েডের এই গল্পটি তিনি কয়েক লক্ষ বার করেছেন এবং অনেককেই অস্বস্তিতে ফেলেছেন। টাইফয়েডের জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, বড় আপার প্রতি তাঁর মমতা ছিল এবং এটা এত বেশি পরিমাণে ছিল যে সবার চোখে পড়ত। একবার ঈদের সময় বোনাস পেলেন না। বোনাস না পেলে ঈদের কাপড় হয় না, আমরা জানতাম। কাজেই আমরা বেশ সহজভাবেই পুরনো কাপড় লন্ড্রি থেকে ইস্ত্রি করিয়ে আনলাম। নতুন কাপড় কিছুই না দেয়াটা খারাপ বলে আমরা তিন ভাই তিন জোড়া মোজা পেলাম। নতুন মোজার সঙ্গে ম্যাচ করাবার জন্যে আমরা বুটপালিশওয়ালার কাছ থেকে জুতা পালিশ করিয়ে আনলাম। এক টাকা নিল প্রতি জোড়া।

ঈদের আগের রাতে দেখি, বাবা বড় আপার জন্যে সাদার মধ্যে লাল ফুল আঁকা একটা ফ্রক নিয়ে এসেছেন। আমাদের কারো জন্যে কিছু আনেন নি। এবং এজন্য তাঁকে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত মনে হলো না। আমাদের মধ্যে সবচে' জেদি হচ্ছে অনু। সে বলল, আমি ঈদ করব না।

বাবা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তুই ঈদ না করলে ঈদ আটকে থাকবে? যত ফালতু বাত।

ঈদের দিন আমরা সবাই মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বাবা বড় আপার হাত ধরে নির্বিকার ভঙ্গিতে তাঁর বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। বড় আপা ছাড়াও যে তাঁর আরো ছেলেমেয়ে আছে তা বোধহয় তিনি মনে করতেন না।

মনসুর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, ফাইন চা।

চা তেমন কিছু ফাইন নয়। কিন্তু মনসুর আজ সবকিছুতেই ফাইন বলবে। আলগা একটা ফুর্তির ভাব মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখবে। খুব সম্ভব ওর ধারণা হয়েছে, হাসপাতাল থেকে আমি আর ফিরব না। ডাক্তাররা ওকে কিছু হয়তো বলেছে।

মনসুর আবার বলল, ফাসক্লাস চা হয়েছে রে।

আরেক কাপ খাবি ?

না।

আমি সিগারেট ধরালাম। অন্য সময় হলে মনসুর ছোঁ মেরে সিগারেট নিয়ে ফেলে দিত। আজ কিছুই করল না। এসব ভালো লক্ষণ নয়। তা হলে কি ফেরার লক্ষণ একেবারেই নেই ? ওয়ান ওয়ে জার্নি ?

পিজি-র যে ডাক্তার আমার অপারেশন করবেন, তাঁর কথাবার্তায় অবশ্যি সে-রকম মনে হয় না। আমার ধারণা ছিল, বুড়ো না হলে প্রফেসর হওয়া যায় না। কিন্তু এ ভদ্রলোকের বয়স মনে হয় চল্লিশও হয় নি। কানের কাছের কয়েকটি চুল শুধু পাকা। চমৎকার চেহারা। দেখে মনে হয় এই লোকটি রাগ করতে জানে না। চেঁচিয়ে কথা বলতে জানে না। মিথ্যা কথা বলতে পারে না। এ শুধু সবার সঙ্গে মজার মজার গল্প করে এবং ছুটিছাটা পেলেই ছেলেমেয়েদের হাত ধরে পার্কে-টার্কে বেড়াতে যায়, বাদাম কেনে, কিন্তু বাদামের খোসাগুলো যেখানে-সেখানে ফেলে না, আধ মাইল হেঁটে ডাস্টবিনে ফেলে আসে।

ভদ্রলোক কথাবার্তায়ও খুব চমৎকার। শুরু করলেন এইভাবে— তারপর ফরিদ সাহেব, পেট কাটবার জন্যে তৈরি তো ? হুঁ, চর্বি-টর্বি বিশেষ নেই। আরাম করে চামড়া কাটা যাবে। সার্জন হয়ে কী মুসিবত হয়েছে জানেন ? কাউকে দেখলেই কেটে ফেলতে ইচ্ছা করে। হা-হা-হা।

ডাক্তারদের নিয়ে একটা ভালো রসিকতাও করলেন। এক রোগীর অপারেশন হবে। তাকে অপারেশন টেবিলে শোয়ানো হয়েছে। সে কাঁপা গলায় সার্জনকে বলল, স্যার, এটা আমার প্রথম অপারেশন। বড় ভয় লাগছে। সার্জন ভদ্রলোক তখন নার্ভাস গলায় বললেন, আমারও প্রথম অপারেশন। আমারও ভয় লাগছে

ভাই। রোগীকে এনেসথেশিয়া করা হচ্ছে। জ্ঞান হারাবার আগ মুহূর্তে রোগী শুনল, সার্জন সাহেব একমনে দোয়া ইউনুস পড়ছেন।

গল্প শেষ করে তিনি শব্দ করে হাসলেন। বড় ডাক্তাররা এত শব্দ করে হাসে না এবং গল্পগুজবও করে না। বোধহয় ইনি বড় ডাক্তার নন। আমি বললাম, আশা করি আমার পেট কাটার আগেও আপনি কিছু কাটাকাটি করেছেন ?

ডাক্তার সাহেব আবার ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন এবং তাঁর জীবনের প্রথম অপারেশনের গল্প করতে লাগলেন। বেশ জমাট গল্প। ইনি আমার সঙ্গেই এমন গল্পগুজব করলেন, না সবার সঙ্গেই করেন ? শুধু আমার সঙ্গে করে থাকলে তার অর্থ অন্যরকম হয়।

মনসুর উঠে দাঁড়াল। সহজ স্বরে বলল, অফিসের সময় হয়ে গেল, যাই। বিকেলে আসব।

চল, এগিয়ে দিয়ে আসি।

এগিয়ে দিতে হবে না। শুয়ে থাক্। ঘুম দে।

সোমবার থেকে শুয়েই থাকব, এখন একটু হাঁটাহাঁটি করি।

আমি মনসুরকে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। চেনা পানের দোকান থেকে দশটা ফাইভ ফাইভ কিনলাম। মনসুর দেখল। কিছুই বলল না। ভালো লক্ষণ নয়। তার নিষেধ করা উচিত ছিল।

বিকেলে ঘরে থাকিস, আমি আসব।

কাজ থাকলে আসার দরকার নেই।

না, কাজ কিছু না। আর শোন্, রাতে আমার এখানে খাবি। আমি বৌকে বলে এসেছি।

ঠিক আছে। সিগারেট খাবি নাকি একটা ?

মনসুর একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগল।

আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। মানুষের উপর আমার মায়া পড়ে না। কিন্তু জড়বস্তুর উপর সহজেই মায়া পড়ে যায়। আমার সবসময় মনে হয়, জড়বস্তুরও যেন একটা আলাদা জীবন আছে। এবং তারাও যেন মানুষের মতো ভালোবাসতে পারে।

ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষায় অ্যালাউ হবার জন্য ছোট মামা আমাকে একটা রাইটার কলম কিনে দিয়েছিলেন। রোজ এটাকে বালিশের নিচে নিয়ে ঘুমাতাম এবং ঘুমাবার আগে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতাম, যেমন— কী ভাই, ঘুম পেয়েছে ? আচ্ছা ঠিক আছে, ঘুমাও। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং বাবা আমাকে প্রচণ্ড চড় দিয়ে মেঝেতে উল্টে ফেলে দেন। সেই সঙ্গে হুঙ্কার দিতে

pathagar.net

থাকেন, মানুষের সাথে কথা নাই, কলমের সঙ্গে কথা। পাগল-ছাগলের ঝাড়। পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব, আর যদি কোনোদিন শুনি।

এই ঘরটির উপর আমার মায়া পড়ে গেছে, দীর্ঘদিন থাকলাম এখানে। প্রায় দু বছর। বত্রিশ বছর যদি আয়ু হয়, তা হলে জীবনের ষোলভাগের একভাগ। বড় দীর্ঘ পরিচয়। দশ ফুট বাই আট ফুট এই কামরায় আর কি কোনোদিন ফিরে আসব? কত পরিচিত জিনিস চারিদিকে! কত কিছুই-না আছে! লেজ নেই একটি বুড়ো টিকটিকি। এর কোনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী নেই, এর পাশে অন্য কোনো টিকটিকি কোনোদিন দেখি নি। আরো দুটি আছে, তারা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। এই বুড়োটির সাথীরা একে ছেড়ে গেছে।

বাথরুমে কুৎসিত একটা মাকড়সা আছে। সে শুধু কুৎসিত নয়— ভয়াবহ। তার পেটে চকচকে রূপালি একটা ডিমের থলি। এই থলি নিয়ে বেশির ভাগ সময়ই বেসিনের নিচে কোনো-এক অন্ধকার কোণে লুকিয়ে থাকে। রাতদুপুরে হঠাৎ করে বেরিয়ে এসে আমাকে দারুণ চমকে দেয়।

আমার এ ঘরে একটি মাত্র জানালা। বেশ বড়সড় জানালা। তবে তেমন কিছু জানালা দিয়ে দেখা যায় না। শুধু পাশের ফ্লাটের অনেকখানি চোখে পড়ে। একটি বালিকাকে প্রায়ই দেখি বারান্দায় বসে আচার খাচ্ছে কিংবা পা ছড়িয়ে বই পড়ছে। সুন্দর দৃশ্য। এই মেয়েটির উপরও মায়া পড়ে গেছে। সোমবারের পর এই চমৎকার দৃশ্যটিও হয়তো আর দেখা যাবে না।

জীবনের ষোলভাগের একভাগ যেখানে কাটল তার উপর মায়া তো পড়বেই। পড়াই স্বাভাবিক। টাঙ্গাইলের এক হোটেলে একবার সাত দিন ছিলাম। এমন মায়া পড়ে গেল! ছেড়ে চলে আসবার সময় বুক হু-হু করতে লাগল। চোখ ভিজে ওঠার উপক্রম।

আমি পায়ের কাছ থেকে কাঁথাটা টেনে নিলাম। একটু যেন শীত-শীত করছে। তলপেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। সূক্ষ্ম একটা ব্যথা। মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিচ্ছে— আমি আছি। তোমার ভিতরে বাস করছি। আমাকে ভুলে যাওয়া ঠিক না।

বাইরের রোদ নরম হয়ে আসছে। মেঘ জমতে শুরু করেছে। বর্ষা আসি আসি করছে। এবার খুব জাঁকিয়ে বর্ষা আসবে। তার সাজসজ্জা টের পাওয়া যাচ্ছে। আমার ঘর থেকে আকাশ দেখা যায় না। কেন যেন মেঘ দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি উঠে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। আচার-খাওয়া সেই বালিকাটি রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৈশোরে এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে

আমার পরিচয় ছিল। মেয়েটির নাম নীলিমা। তার বাবা নেত্রকোনা কোর্টের পেশকার ছিলেন।

সেই নীলিমাও খুব আচার খেত। ক্লাস নাইনে ওঠামাত্র নীলিমার বিয়ে হয়ে গেল। আমি তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য রাত জেগে পড়ছি। বাবা রোজ একবার করে বলছেন— ডিভিশন না পেলে জুতো দিয়ে পিটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব।

নীলিমার বিয়ে আমাকে অভিভূত করে দিল। বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হলো। রাতে বালিশে মুখ গুঁজে ভেউভেউ করে কাঁদলাম। বড় আপা অবাক হয়ে বললেন, এই তোর কী হয়েছে রে?

পেট ব্যথা।

কোন জায়গায় ব্যথা, দেখি?

আমি আরো শব্দ করে কাঁদতে লাগলাম। বড় আপা মাকে ডেকে আনল এবং দুপুররাতে মা আমার পেটে তেল মালিশ করতে লাগলেন।

কৈশোরের সেই বিরহ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আমি যথারীতি পরীক্ষা দিই এবং সবাইকে অবাক করে একটি লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হয়ে পড়ি।

এই আচার-খাওয়া মেয়েটির সঙ্গে খুব সম্ভব নীলিমার কোনো মিল নেই, তবু মাঝে মাঝে এই মেয়েটিকে নীলিমা ভাবতে ভালো লাগে। শুধু এই মেয়েটিকে কেন, পৃথিবীর সব বালিকাকেই আমার কাছে নীলিমা বলে মনে হয়।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। আমি পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে বাইরে। চারদিক অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি নেই। মনসুরের আসবার কথা চারটায়, বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে নিশ্চয়ই। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি, বারান্দায় হারিকেন জ্বালাবার চেষ্টা করছেন করিম সাহেব। তাঁর ঘর থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ আসছে। কুকারে ভাত চড়িয়েছেন বোধহয়। করিম সাহেব আমাদের মতো হোটেলের খান না। নিজে রান্না করেন।

এই যে ফরিদ ভাই, আজ শরীরটা কেমন?

ভালোই।

ব্যথা-ট্যথা নেই তো?

জি-না।

ঘুমিয়েছিলেন নাকি?

জি।

দেশ ভাসিয়ে দিয়েছে বৃষ্টিতে। ক্যাট্‌স্ অ্যান্ড ডগ্‌স্ যাকে বলে। চা খাবেন নাকি ?

জি-না, থাক।

আসেন আসেন, এক কাপ চা খান। চা সবসময় খাওয়া যায়।

করিম সাহেবের ঘরে গিয়ে বসতে হলো। চাও খেতে হলো। আজকাল লোকজন আমাকে খুব খাতির করছে।

অপারেশনের ডেট দিয়েছে ?

জি-না।

অপারেশন আজকাল ডালভাত হয়ে গেছে। ভয়ের কিছুই নাই। তলপেটের অপারেশন তো এখন চোখ বন্ধ করে বাঁ হাতে করে। হা-হা-হা।

আমি চুপ করে রইলাম। পরিচিত-অপরিচিত প্রায় সবাই এখন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে অপারেশনটা কত সহজ। আমার দিক থেকে তার কোনো প্রয়োজন নেই। অপারেশনটা সহজ কিংবা জটিল, তাতে কিছু যায় আসে না। করিম সাহেব চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বললেন, কত সিরিয়াস অপারেশন এখন হচ্ছে— হার্ট, ব্রেইন। একেবারে ছেলেখেলা ব্যাপার।

তা ঠিক।

করিম সাহেব ভাত টিপে দেখলেন। তারপর বেশ আন্তরিকভাবেই বললেন, আজ চারটা ভাত খান-না আমার সঙ্গে, খাঁটি গাওয়া ঘি আছে। বেগুন ভাজা, গাওয়া ঘি। তার সঙ্গে শুকনো মরিচ ভেজে দেব। খারাপ লাগবে না।

আজ থাক। আরেকদিন খাব।

আজ অসুবিধা কী ? বৃষ্টির দিন হোটেলে যেতে কষ্ট হবে। আসেন দুজনে মিলে খাই।

আমাকে নিতে আসবে, এক জায়গায় খাওয়ার কথা আছে।

এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আসবে কীভাবে ?

কথাটা সত্যি। বেশ দুর্যোগ বাইরে। রাস্তায় বাতিও নেই। মনসুর আসতে পারবে বলে মনে হয় না। তবুও সে আসবে। আমি আমার অন্ধকার ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মোমবাতি আছে, তবুও জ্বালাতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কে যেন বলেছিল— প্রতীক্ষা করতে হয় অন্ধকারে। বোধহয় মিলনের প্রতীক্ষার কথা বলা হয়েছে। বসে থাকতে থাকতে আটটা বেজে গেল। আমি যখন প্রায় নিশ্চিত মনসুর আসবে না, তখন সে এলো। গা দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা, কাঁপছে ঠকঠক করে।

রিকশা দাঁড় করিয়ে এসেছি, চল।

মনসুরের বাসায় যেতে আমার ভালো লাগে না। সে নতুন বিয়ে করেছে। নতুন বউরা স্বামীর বন্ধুদের সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এমন ভাব দেখায় যেন স্বামীর বন্ধুদের জন্য খুব ব্যস্ত। মনসুরের বউ সে ভাবটাও দেখায় না। সে স্পষ্টতই বিরক্ত হয়। সবাই তার বিরক্তি ধরতে পারে। মনসুর পারে না। উঠতে গেলেই মনসুর বলে, এত তাড়া কী রে, আরেকটু বোস, আরেকটু বোস।

মনসুরের স্ত্রী রীনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, বসতে বলছে, বসুন না। মনসুর তাতে উৎসাহ পায়। হাসিমুখে বলে, রীনা, আমাদের একটা গান শোনাও না। প্লিজ!

আজ না, আরেক দিন।

আহ, শোনাও না! এই, তোরা একটু রিকোয়েস্ট কর না! তোরা রিকোয়েস্ট করলে শোনাবে।

রিকোয়েস্ট করতে ইচ্ছে হয় না, তবু করতে হয় এবং এক সময় রীনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনায়— 'আজি এ বসন্তে...।'

মাঘ মাসের দুর্দান্ত শীতে বসন্তের গান শুনে আমরা প্রশংসা করি। মনসুর দাঁত বের করে হাসে। এর বুদ্ধিসুদ্ধি এমনিতেই কম। বিয়ের পর আরো কমে গেছে। তার ধারণা হয়েছে, এরকম একটা ভালো বিয়ে পৃথিবীর কেউ করে নি। শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে তার উৎসাহ সীমাহীন। কেনটাকিতে তার স্ত্রীর এক ভাই থাকে। তাদের নতুন কেনা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ডেন্ট পড়ে গেছে। এই নিয়ে মনসুরের চিন্তার শেষ নেই। অথচ সে ভাইকে সে চোখেও দেখে নি।

কাণ্ডটা দেখ, নতুন কেনা গাড়ি। সিক্স থাউজেন্ড ইউএস ডলার দাম। অবশ্যি ইনসুরেন্স আছে। সব কভার করবে।

আমরা উৎসাহ না দেখালেও ক্ষতি নেই। মনসুর মুগ্ধ ভঙ্গিতে শ্বশুরবাড়ির গল্প করে যাবে— বুঝলি ? আমার শ্বশুর সাহেবের ইচ্ছা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকা। গ্রামের বাড়ি হলে কী হবে, হুলুস্থুল ব্যাপার। বাড়ির পিছনে আলিশান পুকুর। গত বৎসর তিন হাজার টাকার রুইয়ের পোনা ছাড়া হয়েছে। এর মধ্যেই এক হাত বড় হয়ে গেছে।

নির্বোধের মতো গল্প। শুনলেই অস্বস্তি হয়। তবু শুনতে হয়। হাসতে হয়। ভান করতে হয় যেন খুব আগ্রহবোধ করছি। রীনা বসে থাকে পাথরের মূর্তির মতো। তার চোখে-মুখে তাচ্ছিল্যের একটা ভাব। মনসুরের গল্পগুলি সে কীভাবে গ্রহণ করে বুঝতে পারি না।

আজ অবশ্যি রীনা খুব যত্ন-টত্ন করল। তোয়ালে নিয়ে এলো মাথা মোছার জন্যে এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, মাথা নিচু করুন, আমি মুছিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার বিস্ময় গোপন করে বললাম, কোনো রমণীর কাছে আমি মাথা নিচু করি না। চির উন্নত মম শির।

রীনা একটু হকচকিয়ে গেল। আমি কথাবার্তা কম বলি। এরকম কিছু বলব আশা করে নি বোধহয়। মনসুর উঁচু গলায় বলল, আজ আমাদের ম্যারেজ-ডে।

তাই নাকি ?

আরে গাধা, রীনার ড্রেস দেখে বুঝতে পারছিস না ? বিয়ের শাড়ি। তুই আর আমি গিয়ে কিনলাম নগদ দুই হাজার টাকায়। টাকা শর্ট পড়ল, তোর কাছ থেকে নিলাম দুশ' টাকা। মনে নেই কিছু ?

শাড়ির ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ল না কেন ? ঝড়-বাদলার দিনে কোনো মেয়ে তো এমন বেনারসি পরে ঘরে থাকে না। ঘরে অবশ্যি ইলেকট্রিসিটি নেই, হারিকেন জ্বলছে। তবুও এ আলোতেও তো চোখে পড়া উচিত ছিল। মনসুর নিচু গলায় বলল, কেকের অর্ডার দিয়েছিলাম, সেটা আনতে গিয়েই দেরি হলো। কেকের উপর লেখা থাকবে— 'রীনার জন্যে'। শালা শুয়োরের বাচ্চারা লিখেছে— 'মীনার জন্য'। যে লেখে সেই ব্যাটার জন্য অপেক্ষা করতে করতে দেরি হলো। শালা আর এলোই না। কাণ্ড দেখ।

কেকটা আবার কেন ?

রীনার ইচ্ছা খাওয়াদাওয়ার পর কেক কাটবে। বয়স তো বেশি না, ছেলেমানুষ এখনো। নে, একটা সিগারেট খা। খাবার গরম করতে সময় লাগবে।

এখন অনেক কিছুই আমার চোখে পড়ছে না। এত বড় একটা কেকের বাক্স সঙ্গে ছিল, কিন্তু আমার চোখে পড়ে নি। আমি হালকা স্বরে বললাম, বিবাহ বার্ষিকী-টার্ষিকী নিজেদের মধ্যে করতে হয়। আমাকে শুধু শুধু ডাকলি কেন ?

মনসুর গলা ফাটিয়ে হাসল, যেন আমি খুব একটা হাসির কথা বলেছি। আমি বললাম, উপলক্ষটা বললে একটা কিছু আনতে পারতাম।

শালা, তুই আবার আনবি কী ? শুধু ফর্মালিটি।

মনসুর গভীর মনোযোগের সঙ্গে কেকের লেখা মীনাকে রীনা বানানোর চেষ্টা করতে লাগল। রীনা একবার জিজ্ঞেস করে গেল, চা দেব ভাই ? খাবার দিতে দেরি হবে। একটা জিনিস ভাজতে হবে। কুমড়ো ফুলের বড়া।

না, চা লাগবে না।

খান-না একটু, আমিও আপনার সঙ্গে খাব।

ঠিক আছে, আনুন।

মনসুর গম্ভীর হয়ে বলল, রীনাকে তুই আপনি-আপনি করিস কেন ? তুমি করে বলবি। স্ট্রেইট তুমি।

আমি কিছু বললাম না। ওর এই বিচিত্র স্বভাব, বন্ধুবান্ধবকে সে তাদের দু'জনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চায়। এটা যে হবার নয়, তা বুঝতে চায় না।

আমি হালকা সুরে বললাম, আর কাউকে বলেছিস ?

নাহ, শুধু তোকে। অনলি ইউ।

কেন, শুধু আমাকে কেন ?

মনসুর তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি সহজভাবেই বললাম, তোর কি ধারণা আমি আর ফিরে আসব না ?

মনসুরের মুখ কালো হয়ে গেল। এই কথাটি তাকে না বললেই হতো। কেন বললাম ?

রীনা চা নিয়ে এসে বসল আমার সঙ্গে। বেশ লাগছে মেয়েটিকে। এমনিতে তাকে এতটা ভালো লাগে না। আমি লক্ষ করেছি, অসুন্দর মেয়েদেরও মাঝে মাঝে অপরূপ রূপবতী মনে হয়, যেমন গায়ে-হলুদের দিন। শুধু এই দিনটিতেই কোনো বিচিত্র কারণে তারা দেবীমূর্তির মতো হয়ে যায়।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা চা খাচ্ছি নিঃশব্দে। রীনা খুব কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি বললাম, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে।

বিয়ের শাড়িতে সবাইকে সুন্দর লাগে।

তাই না-কি ?

হ্যাঁ।

আর কোনো কথা পাচ্ছি না। মনসুর বসে আছে গম্ভীর হয়ে। সে কি কেকের মীনাকে রীনা করেছে ? আমি বললাম, কটা বাজে রে ?

যতটা বাজুক, তুই বসে থাক চুপচাপ। রাতে তোকে যেতে দেব না।

বলিস কী!

রীনা নিচু স্বরে বলল, হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে কটি দিন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

মনসুর বলল, আমি কাল সকালে তোর জিনিসপত্র সব নিয়ে আসব।

নতুন জায়গায় আমার ঘুম হয় না।

না হলে না হবে। ফালতু কথা!

রীনা বলল, আপনি থাকবেন বলে আপনার বন্ধু চাদর-বালিশ এইসব কিনে এনেছে। না থাকলে ওর কষ্ট হবে। কয়েকদিনের ব্যাপার তো, থেকে যান।

আমি কঠিন স্বরে বললাম, মনসুর, আমি জানি আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসব না। কাজেই যে ক'টা দিন আমি আছি, আমাকে নিজের মতো থাকতে দে। এই নিয়ে ঝামেলা করিস না।

মনসুর গম্ভীর স্বরে বলল, এখানে তো কোনো কষ্ট হবে না।

pathagar.net

জানি কষ্ট হবে না। এখানে অনেক সুখে থাকব। তবু তুই আমাকে আমার মতো থাকতে দে।

রীনা বলল, আজকের রাতটা অন্তত থাকুন। বেচারা আপনার জন্যে নতুন চাদর বালিশ কিনেছে।

আমি কিছু বললাম না। রীনা নরম স্বরে বলল, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ফেরত যাবেন কীভাবে ? রাতও অনেক হয়েছে। আজকের রাতটা থাকুন। এক রাতে কী হবে ?

ঠিক আছে, থাকব।

মনসুর মুখ কালো করে বলল, ইচ্ছা না হলে থাকতে হবে না।

কিছু-কিছু মানুষের বয়স বাড়ে না। তারা মনসুরের মতো সারা জীবন শিশু থেকে যায়। আজ সারারাত সে হয়তো কথাই বলবে না। অথচ আমাকে এখানে এনে জড়ানোর তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আজকের এই ঝড়-জলের রাত হচ্ছে তাদের দু'জনের। আজ তাদের একটা চমৎকার উৎসবের রাত। আমার এখানে স্থান কোথায় ?

অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত পরিবেশে আমি ঘুমুতে পারি না। তার উপর আজ বিকেলেই বড় একটা ঘুম দিয়েছি। আমি মশারির ভেতর গা এলিয়ে শুয়ে রইলাম। ঘুম আসবে না জানি, ঘুমাবার চেষ্টা চালিয়ে যাবার কোনো অর্থ হয় না।

মেঝেতে হারিকেন ডিম করা। কেমন গ্রাম-গ্রাম্য লাগছে। আলো না থাকলেই বোধহয় ভালো ছিল। কিন্তু মনসুর শুধু হারিকেন নয়, একটা টর্চলাইটও বালিশের নিচে রেখে গেছে। যত্নের চূড়ান্ত করতে চেষ্টা করছে দু'জনেই।

টেবিলের উপর ঝকঝকে পানির জগ, গ্লাস। রাতে খিদে পেলে খাওয়ার জন্যে হরলিক্সের টিনে কিছু বিসকিট। শোবার আগে রীনা এলো মশারি গুঁজে দিতে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, ছি-ছি ! আমি বুঝি মশারি গুঁজতে জানি না ? লাভ হলো না। মনসুর কমপক্ষে দশবার বলল, অসুবিধা হলেই ডাকবি। আমার পাতলা ঘুম, একবার ডাকলেই হবে।

ঘড়িতে রাত একটা। ফিসফিস করে ওরা কথা বলছে। এক বৎসর পরও এত কথা থাকে নাকি কারো ? স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার কথাবার্তা শুনতে বড় অস্বস্তি লাগে। ওদের কথাবার্তা অবশ্যি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, তবু বড় অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে একটা-কিছু অপরাধ যেন করে ফেলেছি।

আমার বড় ভাইয়ের বিয়ের পরও এমন অবস্থা। তাদের লাগোয়া ঘরটিতে আমি থাকি। গভীর রাত পর্যন্ত দু'জন কথা বলে। শুনতে ইচ্ছা করে না, তবু শুনতে হয়। কত অর্থহীন কথাবার্তা। অর্থহীন রসিকতা। সকালবেলা ঘুম ভেঙে

ভাবিকে দেখলেই বড় লজ্জা লাগে। চোখ তুলে তাকাতে পারি না, এমন অবস্থা। ভাবির আচার-আচরণ কিন্তু খুব স্বাভাবিক। সবার সঙ্গে হাসছে, গল্প করছে। নতুন নতুন রান্নাবান্না করছে। ভাবিকে দিয়ে আমাদের সংসারের শ্রী ফিরে গেল। বাবা পর্যন্ত নিচু স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। মাঝেমধ্যে হাসতেও লাগলেন।

তারপর একদিন বাসায় এসে শুনি, বড় ভাই আলাদা বাসা করছেন। তাঁর শ্বশুর নাকি অল্প ভাড়ায় একটা বাসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। শুধু বাসাই নয়, তিনি নাকি তাকে কী-একটা সাইড বিজনেসের কথাও বলছেন। টাকা তিনি দেবেন। বড় ভাই অতিরিক্ত রকমের উৎসাহের সঙ্গে বললেন, এই সংসারের খরচ আমি আগে যেমন দিতাম, এখনো দেব। চিন্তা কিছু নাই। মা বিশেষ ভরসা পেলেন না। মায়েরা অনেক জিনিস আগে আগে বুঝতে পারে।

আসলে আমাদের কারোরই মা-বাবার প্রতি টান ছিল না। মেজো ভাই জার্মানি গিয়ে চুপচাপ হয়ে গেল। দুমাস-তিনমাস পরপর চিঠি আসে। একটি চিঠিতে জানলাম, ল্যাঙ্গুয়েজ পরীক্ষায় পাস করতে পারে নি। সম্ভবত তাকে দেশে ফিরে আসতে হবে। বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে পড়লেন। সে অবশ্যি দেশে ফিরল না। মাস ছয়েক পর চিঠি এলো, সুইডেনে চলে এসেছে। সে চিঠিতে কোনো ঠিকানা নেই, লেখা আছে— এখনো কোনো স্থায়ী ঠিকানা হয় নাই। হওয়ামাত্র জানাইব।

এক বৎসরেও তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা হলো না। আমরা তাকে কিছু লিখতে পারি না। কোনো খবর দিতে পারি না। কী অবস্থা! এর মধ্যে খবর পাওয়া গেল, কাগজপত্র না থাকায় তাকে নাকি সুইডেনের এক জেলখানায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। খবর কতটুকু সত্যি জানার উপায় নেই।

সে-সময় আমাদের এখানেও অনেকগুলি খবর তৈরি হলো, যেগুলি তাকে জানানো গেল না। যেমন— অনুর বিয়ে হয়ে গেল নারায়ণগঞ্জের এক উকিলের সঙ্গে। খুবই ভালো বিয়ে। শহরের উপর তাদের বাড়ি-টাড়ি আছে। ছেলের চেহারাও সুন্দর। অনুর (যে খানিকটা তোতলিয়ে কথা বলে) এতটা ভালো বিয়ে হওয়ার কথা ছিল না। আমরা খুবই খুশি। পরে অবশ্যি জানা গেল, উকিল সাহেব আগে একবার বিয়ে করেছিলেন এবং সেই বিয়ের একটি ছেলেও আছে। দ্বিতীয়বার বিয়ের সময় প্রথম স্ত্রীর খবর চেপে গিয়েছেন। ভদ্রলোক কেন এটা করলেন কে জানে!

বিয়ের এই খবর মেজো ভাইকে জানানো গেল না। মা মারা যাবার খবরও জানানো গেল না। তিনি মারা গেলেন হঠাৎ করে। রাতেরবেলা জেগে উঠে বললেন, তাঁর বুক জ্বালা করছে। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, ও কিছু না, খেসারির ডাল বেশি খেয়েছ, তাই অম্বল হয়েছে। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে শুয়ে থাক।

মা তাই করলেন। ঘণ্টাখানিক পর উঠে বললেন, বুক জ্বলে যাচ্ছে। বাবা বললেন, এক গ্লাস লেবুর সরবত করে খাও। খেয়ে শুয়ে থাক।

বাবার কথা মা'র কাছে নবীর ওহীর মতো। ঘরে লেবু ছিল না। চিনির সরবত বানিয়ে খেলেন এবং ছটফট করতে লাগলেন। বাবা বললেন, চেঁচামেচি করলে কি আর ব্যথা কমবে ? শুয়ে থাক। ভোরবেলা ডাক্তারকে খবর দেব।

শেষরাতে আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তাররা বললেন, ফুড পয়জনিং। আলু-পটলের তরকারি এবং খেসারির ডাল খেয়ে আমাদের কারো কিছু হলো না, মা'র ফুড পয়জনিং হয়ে গেল! কোনো মানে হয় ?

বৃষ্টি থেমে গেছে। মনসুরের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? আমি সাবধানে উঠে বসলাম। তলপেটের ব্যথাটা টের পাচ্ছি। লক্ষণ ভালো নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ব্যথা আমাকে কাবু করে ফেলবে। মনসুরকে হয়তো ডাকতে হবে। আমি প্রাণপণে ব্যথাটা সামাল দিতে চেষ্টা করলাম। কিছু-কিছু জিনিসকে কিছুতেই সামাল দেয়া যায় না। একেও যাবে না। এর নিজস্ব একটি জীবন আছে। মাথা ঝিম-ঝিম করছে। মনে হচ্ছে, নাড়িভুঁড়ি ফেটে বেরিয়ে আসবে। ডাকব না ওদের, কিছুতেই ডাকব না। বমি করতে ইচ্ছা হচ্ছে। হারিকেনের আলো ক্রমেই বাড়ছে। আমি মৃদু স্বরে মাকে ডাকলাম, মা, তুমি কোথায় আছ ? এসো, ব্যথা কমিয়ে দাও।

পাশের ঘর থেকে শব্দ হচ্ছে। মনসুর উঠে আসছে। রীনার গলা পাওয়া যাচ্ছে। কী যেন বলছে সে। আমি ক্ষীণ স্বরে ডাকলাম, মনসুর। কেন ডাকলাম ? সে কিছুই করতে পারবে না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া এখন কেউ কিছু করতে পারবে না। তবু মনে হয়, কেউ আসুক। পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকুক। মনসুরের গলা পাওয়া যাচ্ছে, এই ফরিদ, কী হয়েছে ? আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, মরে যাচ্ছি! আমি মরে যাচ্ছি!

মনসুর আমার হাত ধরে রেখেছে। রীনা বসে আছে আমার ডান পাশে। সে বড় ভয় পেয়েছে। রীনা ফিসফিস করে বলল, কোথায়, কোন জায়গায় ব্যথা ?

ঘরের আলো কমে আসছে। রীনার মুখ অসম্ভব বড় মনে হচ্ছে। রীনা আবারও বলল, কোথায় ব্যথা ? কোথায় ?

ঠিক অন্য সব দিনের মতোই আমার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখলাম, মনসুর এবং রীনা বসে আছে চেয়ারে। মশারি তোলা। মাথার কাছে একটা ছোট টেবিল-ফ্যান। পাখা ঘুরছে।

কী রে, কেমন লাগছে এখন ?

ভালো।

কিছুক্ষণ পরই তুই ঘুমিয়ে পড়লি। রীনা বলেছিল, তুই অজ্ঞান হয়ে গেছিস। মাথায় পানি ঢাললাম।

আমি ফ্যাকাসেভাবে হাসতে চেষ্টা করলাম।

রীনা বলল, ব্যথাটা আপনার কতক্ষণ থাকে ?

বেশিক্ষণ না। কমে গেলেই ঘুম এসে যায়। লম্বা ঘুম দিয়ে ফ্রেশ হয়ে যাই।

আপনি কিছু খাবেন ? চা আর টোস্ট এনে দিই ? নাকি এক পিস কেক খাবেন ?

চা খাব। শুধু চা।

রীনা উঠে চলে গেল। মনসুর বলল, ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলি! হাত-মুখ ধুবি ? পানি এনে দিই ?

এনে দিতে হবে না। নিজেই বাথরুমে যাব।

চুপচাপ শুয়ে থাক, নড়াচড়া করিস না।

এখন আর কিছু হবে না।

মনসুর বলল, আজ আমি অফিসে যাব না, ঠিক করেছি, ঘরেই থাকব।

সে হাই তুলল। তার চোখ লাল। বেচারা সারা রাত কষ্ট করেছে।

মনসুর!

বল।

চা খেয়ে আমি বেরুব।

কোথায় ?

মিরপুর পাঁচ নম্বর সেকশন। বাবাকে দেখে আসি।

আজ শুয়ে থাক, নড়াচড়া করিস না।

আজ না গেলে আর সময় পাব না।

চল, আমিও যাই সঙ্গে।

না।

আমি তোর সঙ্গে গেলে অসুবিধা কী ?

ভেবেছিলাম, আমাকে যেতে দিতে রীনা আপত্তি করবে। সে করল না। মেয়েটি ভয় পেয়েছে। কাল রাতের মতো কোনো দৃশ্য সে সম্ভবত দ্বিতীয়বার দেখতে চায় না। না চাওয়াই ভালো।

pathagar.net

সারা রাত বৃষ্টি হবার জন্যই বোধহয় রাস্তা-ঘাট ঝকঝক করছে। গাছের পাতা অন্যদিনের চেয়েও বেশি সবুজ। চারদিক চকলেটের রাংতার মতো ঝিলমিল করছে। মন ভালো হয়ে যাবার মতো একটা সকাল। অপূর্ব! এরকম একটি সকালে পুরনো কথা মনে পড়ে না, শুধু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

ভেবেছিলাম, বাসে করে যাব। এই সময় মিরপুরের দিকের বাস ফাঁকা যায়। কিন্তু মনসুরের জন্যে পারা গেল না। সে আমাকে কিছুতেই বাসে উঠতে দেবে না। বাসে উঠলেই নাকি আমার তলপেটের নাড়িভুঁড়ি ঝাঁকুনিতে ফেটে চৌচির হবে। সে বাইশ টাকায় এক বুড়ো রিকশাওয়ালাকে রাজি করিয়ে ফেলল। গলার স্বর নামিয়ে অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, বুড়ো মিয়া, খুব আস্তে আস্তে চালাবেন। রোগী মানুষ। দুদিন পর অপারেশন।

রিকশাওয়ালাকে এত কথা বলার কোনো দরকার নেই। রিকশাওয়ালা চলবে তার নিজের মতো।

ফরিদ!

বল।

চাচাজির সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসবি। আমার এখানে চলে আসবি, স্ট্রেইট চলে আসবি। নো হেংকি-পেংকি।

আমি হাসলাম। যার মানে হ্যাঁ-না দুই-ই হতে পারে।

আসবি কিন্তু।

দেখি।

বুড়ো মিয়া, সিরিয়াস রোগী। রিকশা খুব ধীরে টানবেন। আরেক টাকা বকশিশ আস্তে চালালে। ফরিদ, তেইশ টাকা দিয়ে দিস। শোন, হুড তুলে দে।

বাবা বর্তমানে আছেন নাজির ভাইয়ের সঙ্গে। নাজির হোসেন আমার বড় মামার ছেলে। বৎসর দুই আমাদের বাসায় থেকে পড়াশোনা করেছেন।

এই দুই বৎসরেই তিনি সমগ্র পাড়ায় একটা ত্রাসের সৃষ্টি করেন। সেই সময় তিনি আই. কম. পড়তেন। এবং নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। তাঁর পড়াশোনার কথা আমার মনে নেই, কিন্তু সাতসকালে বালির বস্তার উপর কিল-ঘুসির কথা মনে আছে। অল্পদিনের মধ্যে আমার বড় ভাইও তাঁর সঙ্গে জুটে গেলেন। এবং দুজন একই সঙ্গে ফেল করলেন।

ফেল করবার পর বড় ভাইয়ের উৎসাহ খানিকটা মিইয়ে গেল, কিন্তু নাজির ভাই বিপুল উৎসাহে নাজির ড্রামা ক্লাব খুলে বসলেন। সেই ক্লাবের রিহার্সাল হতো আমাদের বাসায়। দারুণ হৈ-চৈ ব্যাপার। নাজির ভাইয়ের অনেক শাকরেদ জুটে গেল। বাবার মতো লোক পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করতে শুরু করলেন।

ছোটখাট অনেক রকম কাণ্ডকারখানা নাজির ভাই করতে লাগলেন। কিন্তু সবচে' ভয়াবহ ব্যাপারটি করলেন দুর্গাপূজার রাতে। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে মডেল স্কুলের হেডমাস্টার অমিয়বাবুর মেয়ের গলা থেকে ওড়না টেনে পাগড়ি বানিয়ে মাথায় দিলেন এবং অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে ভয়ে নীল হয়ে যাওয়া মেয়েটিকে বললেন— সুফিয়া, বালিকা, তুমি কী করে জানলে ইংরেজ বিজয়ে আমরা অক্ষম ?

সেই রাতেই পুলিশ তাঁর খোঁজে এলো। তিনি পালিয়ে গেলেন সরিষাবাড়ি এবং কাঠের ব্যবসায় লেগে গেলেন। বাবাকে শেষ বয়সে নাজির ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে, এটা ভাবতেও কষ্ট লাগে। কিন্তু কোনো উপায় নেই।

বাবা হয়তো যৌবনে প্রচুর পাপ করেছিলেন, এখন তার প্রায়শ্চিত্তের কাল চলছে। ভাসমান জীবনযাপন করতে হচ্ছে। কিছুদিন ছিলেন বড় ভাইয়ের সঙ্গে। ভালোই ছিলেন। সকালে মর্নিং ওয়াক করতেন। বিকেলে পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকতেন। তারপর ভাবির সঙ্গে ঝামেলা হতে লাগল। যখনই যাই নানা অভিযোগ, ভাবি নাকি ইচ্ছা করে তরকারিতে লবণ বেশি দিচ্ছে। কাজের মেয়েকে বলে দিচ্ছে যেন তাঁর ঘর পরিষ্কার না করা হয়। এখানে থাকার চেয়ে ফুটপাতে পড়ে থাকা ভালো। নিয়ে গেলাম আমার ছোট বোন অনুর কাছে, নারায়ণগঞ্জে। মাস ছয়েক ভালোই থাকলেন। তারপর একদিন তাঁর টিনের ট্রাংক আর দুটি চটের ব্যাগ নিয়ে গেলেন নাজির ভাইয়ের সঙ্গে। সেখানেই নাকি থাকবেন। এখন সেখানেও টিকতে পারছেন না। প্রতি সপ্তাহে চিঠি পেয়েছি, তিনি অনুর কাছে যেতে চান। বেশি দিন তো আর বাঁচবেন না। শেষ কটা দিন মেয়ের সঙ্গে থাকতে চান। নাজির হচ্ছে পরের ছেলে। নিজের ছেলেমেয়ে থাকতে পরের কাছে থাকবেন কেন ? ইত্যাদি। মনে হয় না বাবার সে আশা পূর্ণ হবে। অনু রাজি হবে না।

নাজির ভাই বাসাতেই ছিলেন। তাঁর মুখ এমনিতেই লম্বা। আমাকে দেখে সেই মুখ আরো লম্বা হয়ে গেল। আমি বললাম, কেমন আছেন নাজির ভাই ?

ভালো। তুমি কেমন আছ ?

ভালোই আছি।

হাসপাতালে নাকি ভর্তি হচ্ছ ?

হুঁ।

হয়েছেটা কী ? সিরিয়াস কিছু ?

টিউমার।

ক্যানসার নাকি ? না শুধু টিউমার ?

জানি না, ডাক্তার তো কিছু বলে না।

এইসব জিনিস কি আর ডাক্তার আগ বাড়িয়ে বলবে ? বুঝে নিতে হয়।

আমার মনে হলো, নাজির ভাই আমার অসুখের খবরে বেশ খুশিই হলেন। লোকটিকে আমি দেখতে পারি না। এই কারণেও এরকম মনে হতে পারে। মানুষ যত খারাপই হোক অন্যের অসুখে খুশি হয় না। তা ছাড়া নাজির ভাইয়ের সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই।

ফরিদ!

জি ?

ফুপাকে আমার এখান থেকে নিয়ে যাও। তোমার ভাই বা বোনের কাছে রাখ। এখানে আর পোষাচ্ছে না।

ঠিক আছে।

ঠিক আছে না, এসেছ যখন আজই নিয়ে যাও। আবার কবে আসবে তার কোনো ঠিক আছে নাকি ?

দেখি।

দেখি না। নানারকম যন্ত্রণা। তোমরা তো অন্যের ঘাড়ে চাপিয়েই খালাস।

আমি চুপ করে রইলাম। সত্যি সত্যি আজ নিয়ে যেতে হলে মুশকিল। কিন্তু নাজির ভাইয়ের যা ভাব দেখা যাচ্ছে, আজই হয়তো গুছিয়ে দেবে।

বাবা বাসায় নেই ?

বাজারে গেছে। এসে পড়বে। চা খাও।

না, চা খাব না।

ঠাণ্ডা কিছু খাবে ?

নাহ।

না কেন ? খাও। একটা কোক খাও। পেটটা ঠাণ্ডা থাকবে।

আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে নাজির ভাই ভেতরে চলে গেলেন। এ বাড়িতে পর্দাপ্রথার ব্যাপার আছে। নাজির ভাইয়ের স্ত্রী বোরকা পরেন। বাড়িতে কোনো পুরুষ কাজের লোক রাখা হয় না। নাজির ভাই নিজেও নাকি কোনো পীরের কাছে যাতায়াত করছেন। গত বৎসর শুনেছিলাম হজ্বে যাবেন। লটারিতে নাম ওঠে নি। কোথায় বারো শ' টাকা ঘুস দিলেই ব্যবস্থা হয়। ঘুস দিতে যাওয়াটা ঠিক হবে কি-না বুঝতে না পেরে যাওয়া বাতিল করেছেন। এ বছর আবার চেষ্টা করছেন।

pathagar.net

নাজির ভাইয়ের বসবার ঘরটি বেশ সাজানো। সাজানোর ধরনটাও আধুনিক। ফ্রেমে বাঁধানো কাবা শরীফের ছবি নেই। কামরুল হাসানের একটি পেইনটিং আছে। কার কাছে থেকে মাত্র সাড়ে তিনশ' টাকায় কিনেছেন। দুটি আলমারি আছে, বই-এ ভর্তি। শঙ্কর থেকে শুরু করে রবীন্দ্র রচনাবলী। এইসব বই নাজির ভাই পড়েন বলে মনে হয় না। তবে কেউ-একজন পড়ে নিশ্চয়ই। অনেকগুলো বই ছেঁড়া, যত্ন করে কাগজ দিয়ে মোড়া। পেছনে কলম দিয়ে নাম লেখা।

কোক পাওয়া গেল না, সেভেন আপ নিয়ে এসেছে।

আপনি দোকানে যাবেন না নাজির ভাই ?

যাব। গাড়ি আসবে, এগারোটায়। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে মতিঝিল গেছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, গাড়ি কিনেছেন কবে ?

গত মাসে।

নতুন গাড়ি ?

নতুন গাড়ি কেনবার পয়সা কোথায় ? পুরনো। ড্রাইভারের বেতন দিতে গিয়ে অবস্থা কাহিল।

কত দেন বেতন ?

আট শ'। তোমার খবর বলো।

কী খবর চান ?

করছ কী ?

তেমন কিছু করছি না।

নাজির ভাই বিরক্ত স্বরে বললেন, কখনো তো কিছু করতে শুনি না। চলে কীভাবে ?

চলে কোথায়! চলে না। থেমে থাকে।

চার-পাঁচটা প্রাইভেট টিউশনি করতে, এখনো কর ?

একটা অ্যাড ফার্মে কাজ করি। দুটো টিউশনি করি।

এটাও খারাপ বিজনেস না। এক ঘন্টা পড়াতে একজন চার শ' পাঁচ শ' টাকা চায়, দেখ অবস্থা।

আমি কিছু বললাম না। নাজির ভাইকে মনে হলো ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছেন, কেন কে জানে।

এত বড় অপারেশন করাচ্ছ, হাতে টাকাপয়সা আছে ?

আছে কিছু।

pathagar.net

কত আছে ?

তিন হাজার টাকার মতো আছে।

বলো কী! প্রাইভেট টিউশনি করে এত টাকা জমিয়েছ ?

আমি উত্তর দিলাম না। নাজির ভাই শুকনো গলায় বললেন, দরকার লাগলে চাইবে আমার কাছে। লজ্জা করবে না।

না, দরকার হবে না।

হবে না বুঝলে কীভাবে ? তিন হাজার টাকা আজকাল কিছুই না।

তা ঠিক।

শোনো ফরিদ, তোমার যে ভাই সুইডেনে আছে তার নামটা কী যেন ? বাবুল না ? বাবুলই তো নাম ?

জি।

তাকে টাকাপয়সার জন্য লেখ না কেন ? ভাইয়ের কাছে চাইতে আবার লজ্জা কী ? সৎভাইও না। নিজের মায়ের পেটের ভাই। তোমাদের দাবি আছে।

দেখি, লিখব এবার। তার নিজেরই বোধহয় চলে না।

না চললেও লিখবে। বুড়ো বাপ আছে, তার দায়িত্ব আছে না ?

জি, তা তো ঠিকই।

তার উপর তোমার এত বড় অপারেশন।

আমি লিখব। এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। যে দেখে না তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়। এটাই নিয়ম।

এগারোটার আগেই গাড়ি এসে পড়ল। সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি মনেই হয় না। নতুন কাঁচা টাকার মতো চকচক করছে।

ফরিদ, আমি গেলাম। দুপুরে খেতে আসব। তুমিও দুপুরে খেয়ে তারপর যাবে। হুট করে চলে যেও না।

দেখি।

দেখাদেখি না। আমি এলে তারপর যাবে। ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসবে। অসুবিধা হবে না।

বাবা এলেন বারোটায়। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। এই শরীরে কোথায় হাঁটাহাঁটি করছিলেন কে জানে! আমাকে দেখে প্রথম যে-কথাটি বললেন, সেটি হচ্ছে— কী, আমাকে নিতে এসেছিস ?

কোথায় যাবেন ?

Pathagar.net

অনুর বাসায়। আর কোথায় যাব ? যাওয়ার জায়গা আছে ? অপদার্থ ছেলেপুলে তৈরি করে শেষ বয়সে এই কষ্ট। ছি-ছি।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললাম, আমার অপারেশনের কথা শুনেছেন ?

হুঁ। অপারেশন কবে ?

এখনো ডেট হয় নি। সোমবার হাসপাতালে ভর্তি হবো। একুশ নম্বর কেবিন।

বাবাকে খুব চিন্তামগ্ন মনে হলো। মাথা নিচু করে বসেছিলেন। বেশ কয়েকবার মুখ তুলে তাকালেন। পরাজিত মানুষের মুখ। সারা জীবন অসংখ্য যুদ্ধ করেছেন। এখনো করছেন। একটিতেও জয়লাভ করেন নি। কিছু-কিছু মানুষ কি শুধু পরাজিত হবার জন্যেই জন্মায় ? একসময় থেমে বললেন, নাজিরের বাসায় আর থাকতে পারব না। হারামজাদা ছোটলোক!

অতি সামান্য আহতই হলাম। বাবা আমার কথা মোটেই ভাবছেন না। আমার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া না-হাওয়ায় তাঁর কিছুই যায় আসে না। তিনি ভাবছেন তাঁর নিজের কথা।

ফরিদ!

বলেন।

ওরা খায় দায় ভালো। খাওয়াটাই তো সব না। ইজ্জত নিয়ে থাকতে হয়। এইখানে পদে পদে বেইজ্জত।

অনুর বাসাতেও তো তাই।

তবু সেটা মেয়ের বাসা। নিজের লোকের কাছে বেইজ্জতি হওয়া অন্য কথা।

বাবা আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। আমি মৃদু স্বরে বললাম, বাবা, আমার কিছু টাকা দরকার। হাজার দুই।

টাকা, আমি টাকা পাব কোথায় ? তোর কি মাথা-টাথা খারাপ ?

বাবা দারুণ চমকে উঠলেন। এতটা চমকানোর প্রয়োজন ছিল না। কারণ তাঁর কাছে টাকা আছে। চার-পাঁচ হাজার থাকার কথা। বেশিও হতে পারে।

মা'র মৃত্যুর পর বাবা ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে বড় ছেলের বাড়িতে থাকতে গেলেন। আলনা, চেয়ার, টেবিল থেকে শুরু করে শিল-পাটা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল। এ ছাড়াও মায়ের দুভরি ওজনের একটা গলার হার ছিল যা বাবা বহু চেষ্টা করেও মা'র জীবদ্দশায় বিক্রি করতে পারেন নি। সেটিও নিশ্চয় এতদিনে বিক্রি হয়েছে। এবং তাঁর মতো কৃপণ লোক একটি টাকাও খরচ করবেন— বিশ্বাস হয় না। সবই জমা আছে।

Pathagar.net

বাবা, অপারেশনে অনেক খরচপত্র আছে।

সরকারি হাসপাতালে অপারেশন-এর আবার খরচ কিসের ?

কেবিন নিয়েছি। কেবিনের চার্জ আছে।

কেবিন নিলি কেন ? কেবিনে কি আলাদা চিকিৎসা হয় ? সব একপদের চিকিৎসা। চেষ্টা-চরিত্র করে জেনারেল ওয়ার্ডে চলে যা।

বাবা, কিছু টাকা দেন। আপনার কাছে তো আছে।

যা আছে সেটা বিড়ি সিগ্রেট খাওয়ার খরচ। একটা পয়সা কেউ দেয় ? বাবুল দিয়েছে কিছু ?

আমি তো দিতাম। মাসে পঞ্চাশ করে দিতাম।

পঞ্চাশে কী হয় ? হোটেলে এক বেলা খেতে লাগে কুড়ি টাকা।

যা পেরেছি দিয়েছি। আপনি এখন কিছু দেন।

আমার কাছে টাকা নেই। বাবুলের কাছে চিঠি লিখলাম, টাকাপয়সার কথা লিখলাম। তার কোনো উত্তর নাই। সে তার মেমসাহেবের ছবি পাঠিয়েছে। হারামজাদা!

দেখি ছবিটা ?

বাবা ছবি আনতে গেলেন। বাড়ির একটি কাজের মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি গোসল করব কি-না। আমি বললাম, আমি এখানে ভাত খাব না। চলে যাব। মেয়েটি মনে হলো বেশ অবাক হয়েছে। আমাকে বোধহয় সেই শ্রেণীর গরিব আত্মীয়দের মতো দেখাচ্ছে যারা ভাত না খেয়ে কখনো যায় না। যাবার আগে টাকা ধার চায়।

না, শুধু মেমসাহেবের ছবি নয়, পুরো ফ্যামিলির ছবি। বিদেশিনী একটি বাচ্চাকে নিয়েছে ঘাড়ে, অন্যটিকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। বাবুল তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর মুখে। বাবুলের চেহারা বিশেষ বদলায় নি। শুধু মোটা হয়েছে। একটু গম্ভীর হয়েছে। কিন্তু মেমসাহেব ছবিতে খুব হাসিখুশি। মনে হচ্ছে এই মেয়েটি কথায়-কথায় হাসে। ছবি অবশ্যি কখনো সত্যি কথা বলে না। আমার নিজের ছবিতে আমাকে খুব হাসিখুশি দেখায়, বাস্তব জীবনে আমি বিশেষ হাসি না। হাসি আসে না।

বাবা, ছেলে দুটি কি ওদের ?

ওদের না তো কার ? রাস্তার বাচ্চা ধরে এনেছে না-কি ? কী যে বেকুবের কথাবার্তা! চেহারাও তো বাবুলের মতো।

মেয়েটার চেহারা তো ভালোই।

মেয়েটা বলছিস কেন ? সম্পর্ক দেখবি না ? সম্পর্ক যা হয় তাই ডাকবি। ভাবি ডাকবি।

এলে ডাকব।

আসবে-টাসবে না।

আমি উঠে পড়লাম। বাবা বললেন, খেয়ে যা। আজ চিতল মাছ এনেছে, বড় চিতল। পেটির মাছটা দিয়ে কোপ্তা করেছে, আর বড় বড় পেটি।

আপনি জানলেন কীভাবে ?

রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আসলাম। অসুবিধা কী ? আমার সাথে কেউ পর্দা করে না। বুড়ো মানুষের সাথে আবার পর্দা কী ?

বাবা আমাকে বাসে উঠিয়ে দিতে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এলেন। অনুর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা হলো না। এখানকার খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে যেতে তাঁর বোধহয় খানিকটা দ্বিধা আছে। বেশ কয়েকবার খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গ এলো।

বুঝলি, এদের খাওয়াটা ভালো। মাসে দু'বার পোলাও হয়।

তাই নাকি ?

নাজির পোলাও খায় না, তার পেটের ট্রাবল। তার জন্যে পোলাওয়ের চালের ভাত। মোহনভোগ চাল। দিনাজপুর থেকে আসে।

ভালোই তো।

নাজিরের বউ রাঁধেও ভালো। রান্নাটা নিজেই করে, চাকরের হাতে দেয় না।

তাই বুঝি ?

হুঁ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খুব। সব জিনিস নিজের হাতে ধোয়।

আপনি সারাদিন রান্নাঘরে বসে থাকেন নাকি ?

রান্নাঘরে বসে থাকব কেন ? মাঝেমধ্যে যাই।

বাসস্ট্যান্ডটা অনেকখানি দূরে। দেখলাম, বাবার কষ্ট হচ্ছে। বয়স হয়েছে। কষ্ট হওয়ারই কথা। আমি বললাম— চলে যান। আসতে হবে না। গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করেন। বাবা তার উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটতেই থাকলেন। বেচারা।

ফরিদ।

বলুন।

কড়া করে একটা চিঠি লেখ বাবুলকে। বাপ-মা'র হক আছে ছেলেপুলের উপর। আছে না ?

pathagar.net

তা তো আছেই।

খুব কড়া করে চিঠি দে। লিখে দে— বাবা অন্যের বাড়িতে ভিক্ষুকের মতো অবস্থান করিতেছেন।

আমি বহু কষ্টে হাসি সামলালাম। ভিক্ষুকের মতো অবস্থান। কঠিন শব্দের প্রতি বাবার খুব টান। একবার চিঠি লিখলেন— বড় বউমার আচরণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আছি। গ্লাস ভাঙার বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করা তার উচিত হয় নাই। আমি তার পিতৃস্থানীয়। গ্লাস এমন কোনো মূল্যবান বস্তু নহে। জগৎই অনিত্য।

দারুণ ফিলসফি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক ভাবটা বাবার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে। কথায় জীবনদর্শন চলে আসছে।

চিঠি কিন্তু দিবি বাবলুকে।

দেব।

আর বেশি করে পানি খাবি।

কেন ?

পানিটা পেটের জন্য ভালো। জল-চিকিৎসা। খুব উপকার হয়।

ঠিক আছে, খাব।

আর শোন, একটা বিয়েশাদি কর। বুড়ো হয়ে গেলি তো!

রোজগারপাতি নাই।

রোজগারপাতি নাই বলেই সংসার করবি না ? ভিক্ষুকরাও তো বিয়েটিয়ে করে। করে না ?

আবার একটা কঠিন শব্দ, ভিক্ষুক।

হাসপাতাল থেকে ফিরেই বিয়ে করে ফেল। চিঠি লিখে দে বাবুলকে টাকা পাঠাতে। তুই ছোট ভাই, তোর হক আছে। বিয়ের খরচ দিতে বল।

ঠিক আছে, লিখব।

বাড়ি ফেরার জন্যে বাবাকে একটা রিকশা করে দিলাম। দু টাকা দিয়ে দিলাম রিকশাওয়ালাকে। বাবা আকাশ থেকে পড়লেন।

এখান থেকে ওখানে রিকশা ? পাগল নাকি!

রোদের মধ্যে কষ্ট করবেন কেন ? চলে যান। হুড তুলে দেন।

বাবা খুবই অবাক হলেন। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। এত অবাক হবার কী আছে ? একজন বুড়ো মানুষের প্রতি আমি একটু মমতা দেখাতে পারি না ? মমতার পরিমাণ খুবই সামান্য, তাতে কী ? কিন্তু বাবা এমনভাবে

pathagar.net

তাকাচ্ছেন, যেন কেঁদে ফেলবেন।

কত নম্বর বেড বললি ?

একুশ নম্বর।

আচ্ছা, একদিন যাব। তুই বাবুলকে চিঠি লিখবি মনে করে।

লিখব।

খুব কড়া করে লিখবি।

আচ্ছা লিখব।

বাবা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে চলে গেল। বাবা বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসেছেন। হুড তোলেন নি। কড়া রোদ। তবু আমার মনে হলো তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে না। গিয়েই হয়তো গোসল সেরে চিতল মাছের পেটি নিয়ে বসবেন। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুবেন। সন্ধ্যাবেলা টিভি সেটের সামনে বসবেন।

আজকের দিনটা বাবার সঙ্গে কাটালেই হতো। ফিরে যাবার একটা ক্ষীণ ইচ্ছা হতে লাগল। যাব নাকি ফিরে ? বললেই হবে, শরীরটা ভালো লাগছে না। বিকেলে বাসায় যাব। কিংবা হয়তো থেকেই গেলাম আজ রাতটা। দোটানা ভাব দীর্ঘস্থায়ী হলো না। বাসে উঠে পড়লাম। পাশের ভদ্রলোক একটা চিত্রালী কিনেছেন। প্রথম পাতায় কোনো-একজন নায়িকার ছবি ছাপা হয়েছে। মোটা মোটা ঠোঁট। ইয়া লাস। বডি বিল্ডারদের মতো ফিগার। এমন একটি ধুমসী মেয়ে কী করে খুকিদের মতো কামিজ পরে আছে কে জানে ? নাম কী নায়িকাটির ? নাম-ধাম লেখা নেই। হয়তো এত পরিচিত যে নামের প্রয়োজন নেই। আমি আগ্রহ নিয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, এই নায়িকার নাম কী ? ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কেন হলেন কে জানে ! বিরক্ত কি আমার অজ্ঞতার জন্যে ? আমার বোধহয় জানা উচিত ছিল কী নাম।

আজ সোমবার।

হাসপাতালে ভর্তি হবার দিন। আজকের দিনটি অন্য আর দশটি দিনের মতো নয়। একটু যেন অন্যরকম। আলো যেন অন্য দিনের চেয়ে ম্লান। বাতাস ভেজা-ভেজা। মানুষের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দিন বদলে যায় নাকি ?

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। শেভ করলাম। নতুন ব্লেড, খুব আরামের শেভ হলো। দাঁত ব্রাশ করতে করতে করিম সাহেবকে বললাম, বেড-টি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে, দিতে পারেন এক কাপ ?

দুধ নাই। দুধ ছাড়া যদি চলে দিতে পারি।

দুধ ছাড়াই দেন।

আজ পাসপাতালে যাওয়ার কথা না ?

জি।

কখন যাবেন ?

তিনটার দিকে। রহমান গাড়ি নিয়ে আসবে।

বলতে বলতে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে রহমান বেশ ছোটাছুটি করে গাড়ি যোগাড় করেছে। যেন হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারটা গাড়ি ছাড়া হবার নয়। গাড়ি করেই যেতে হবে।

গাড়ির ব্যাপারে তার খুবই উৎসাহ। কিছু একটা হলেই সে ছোটাছুটি করে গাড়ি যোগাড় করে ফেলবে। একবার মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে কয়েকজন মিলে যাওয়ার কথা। লাঞ্চ নিয়ে যাব। সারা দিন থাকব। সন্ধ্যাবেলা ফিরব। যাব পাঁচ নম্বর বাসে। ফিরবও বাসে। রওনা হবার কথা সকাল ন'টায়। দেখা গেল, সাড়ে আটটায় রহমান ব্রিটিশ আমলের এক জিপগাড়ি নিয়ে উপস্থিত। সে গাড়িতে দুটি সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। মেয়েদের ছাড়া পিকনিক জমে না, এই জন্যে সে নাকি বহু ঝামেলা করে এদের যোগাড় করেছে। এরা দুজনেই রহমানের দূরসম্পর্কের আত্মীয়।

আমাদের জিপগাড়ি টেকনিক্যালের সামনে এসে চারপায়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর নড়ে না। হুড খুলে বহু খোঁচাখুঁচি, বহু ঠেলাঠেলি। কিছুতেই কিছু হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হলো, গাড়ি ফেলে রেখে গল্প করতে করতে হেঁটেই যাব। জেসমিন নামের মেয়েটি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, হিল পরে আমি হাঁটতে পারব না। আমি রিকশায় যাব।

রিকশা ঠিক করা হলো। সে একা একা এরকম অচেনা জায়গায় যাবে না। অন্য মেয়েটি কোনো এক বিচিত্র কারণে তার সঙ্গে যেতে রাজি নয়। ছেলেদের একজনকে যেতে হয়। কে যাবে ? মনসুর বলল, ফরিদ অসুস্থ মানুষ, ওকে রিকশায় তুলে দিলেই হয়।

জেসমিনের মুখ দেখে মনে হলো ব্যাপারটা সে ঠিক পছন্দ করছে না। সে সম্ভবত যেতে চাচ্ছিল রহমানের সঙ্গে। কিন্তু ঐ মেয়েটি রহমানকে চোখে-চোখে রাখছে।

রহমান আমাদের মধ্যে সবচে' সুপুরুষ। কীভাবে কীভাবে যেন বিদেশী ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি যোগাড় করে ফেলেছে। চেহারার জোর বলাই বাহুল্য। বছরখানিক না ঘুরতেই শুনলাম তার নাকি একটা প্রমোশনও হয়েছে। এখন তার টেবিলে একটা পিবিএক্স লাইন, একটা ডিরেক্ট লাইন। কারো টেলিফোনের দরকার হলে তার কাছে গেলেই হয়। শুধু সোমবার বাদ দিয়ে। কী জন্যে সোমবারটা বাদ, কে জানে ?

আমি রিকশায় উঠতেই রহমান বলল, ছাড়লাম তো দুজনকে, কী হয় কে জানে।

সবাই হাসাহাসি করতে লাগল। জেসমিন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কী অসভ্যতা করছেন রহমান ভাই!

অসভ্যতা আমরা করলাম কোথায় ? অসভ্যতা তো করছ তোমরা।

আবার একটা হাসির দমকা উঠল। জেসমিন মুখ অন্ধকার করে বলল, এই রিকশা, চালাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

পেছন থেকে ফজলু কী যেন বলল। অশ্লীল কিছু নিশ্চয়ই। কারণ ফজলু অশ্লীলতা ছাড়া কোনো রসিকতা করতে পারে না। তার প্রতিটি রসিকতাতেই মেয়েদের শারীরিক কিছু বর্ণনা থাকবেই।

কোনো পরিচিত মেয়ের সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে যাওয়া এ আমার প্রথম। হাত-পা শিরশির করতে লাগল। আমি নিচু স্বরে বললাম, হুড তুলে দেব ?

না, আমার দম বন্ধ লাগে।

মেয়েটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হেঁটে গেলেই ভালো হতো। আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা কি-না বুঝতে পারলাম না। চুপ করে গেলাম। জেসমিন বলল, আপনার রোদ লাগলে হুড তুলে দেন।

না, আমার রোদ লাগছে না।

জেসমিন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হেঁটে গেলে ভালো হতো, কেন বললাম জানেন ?

না।

বললাম, কারণ ওরা আজ সারাদিন আমাদের দুজনকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। খুব খেপাবে।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ, নিজেই দেখবেন। আমি আসলে আসতে চাই নি। রহমান ভাই এত করে বললেন, তাই আসলাম, নয়তো আসতাম না।

আমি হালকা স্বরে বললাম, এসে ভালোই করেছেন, পিকনিকে দু-একজন মেয়ে না থাকলে খুব খারাপ লাগে।

জেসমিন ঘুরে ফিরে রহমানের কথা বলতে লাগল। একজন সুন্দরী মেয়ের মুখে অন্য একজন পুরুষের কথা শুনতে ভালো লাগে না। আমি হ্যাঁ-হুঁ দিয়ে যেতে লাগলাম।

রহমান ভাই আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আমার খালাতো ভাইয়ের দিক থেকে।

ও আচ্ছা।

আমাদের বাসায় অবশ্যি রহমান ভাইয়ের যাতায়াত তারও আগে থেকে। আমরা এক পাড়ায় থাকি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, মালিবাগে। ওয়ারলেস অফিসের কাছে। ওয়ারলেস অফিস দেখেছেন আপনি ?

হ্যাঁ।

ওর উত্তর দিকে। আমাদের অবশ্যি ভাড়া বাড়ি, রহমান ভাইয়ের মতো নিজের বাড়ি নয়।

ঐ বাড়ি রহমানদের নিজের নাকি ?

হ্যাঁ। আপনি কি ভেবেছিলেন ভাড়া বাড়ি ?

হ্যাঁ।

না, ভাড়া না। রহমান ভাইয়ের দাদা বানিয়েছিলেন।

মেয়েটি আমাকে মোটেই পছন্দ করল না, কিন্তু তবুও অনর্গল তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা বলে যেতে লাগল। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি জেনে ফেললাম, ওর এক মামাতো বোনের ইউটেরিয়া অপারেশন হয়েছে। এখন আর তাদের বাচ্চাকাচ্চা হবে না। অথচ ভদ্রমহিলার খুব বাচ্চার শখ। ঘরভর্তি শুধু বাচ্চাদের ছবি। আর ওর বরটি এতই অমানুষ যে, দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা ভাবছে। ছেলেরা খুব হৃদয়হীন হয়। নিজেদের ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না।

রিকশা থেকে নামবার সময় পেরেকে লেগে মেয়েটির শাড়ি অনেকখানি ছিঁড়ে গেল। তার মুখ মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, এখন বাসায় গিয়ে আমি বলব কী?

বাসায় কিছু বলতে হবে নাকি?

বলতে হবে না? শাড়িটা আমার নাকি?

কার শাড়ি?

ছোট আপার শাড়ি। রাজশাহী সিল্ক। একদিনও পারে নি। সে আজ আমাকে মেরেই ফেলবে।

ছিঁড়েছে যে এটা না বললেই হয়। ভাঁজ করে রেখে দেবেন।

ঠাট্টা করছেন? এরকম অবস্থায় কেউ ঠাট্টা করে?

মেয়েদের ব্যাপার আমি ভালো জানি না। হয়তো নতুন শাড়ি ছিঁড়ে ফেলা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মেয়েটির চোখে জল ছলছল করছে। কেঁদেই ফেলবে কি-না কে জানে। বিচিত্র কিছু নয়।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে জেসমিনের সঙ্গে আমার আর কোনো কথা হয় নি। সবার হাসি-ঠাট্টা হজম করে দূরে দূরেই থেকেছি। কিন্তু আধঘণ্টা রিকশায় পাশাপাশি বসার মধ্যে অদ্ভুত কোনো ম্যাজিক আছে। আমি সত্যি সত্যি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম।

এরপর ছুটিছাটা হলেই মগবাজার ওয়ারলেস অফিসের সামনে ঘোরাঘুরি করতাম, যদি কখনো দেখা হয়। আশেপাশের যে কয়টি হলুদ রঙের বাড়ি আছে সব ক'টির সামনে দিয়ে কতবার যে গিয়েছি। দেখা হয় নি কখনো। একদিন শুধু রহমানের সঙ্গে দেখা হলো। সে অবাক হয়ে বলল, এই দিকে কোথায়?

একজনকে খুঁজছি।

বলে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছি, অথচ খুব সহজেই জেসমিনের ঠিকানা জিজ্ঞেস করা যেত। ইচ্ছা করে নি।

আমি চাচ্ছিলাম কারো সাহায্য নিয়ে নয়, নিজেই তাকে খুঁজে বার করি।

তারপর সত্যি সত্যি একদিন দেখা হয়ে গেল। মেয়েদের সঙ্গে আমি কখনো সহজভাবে কথা বলতে পারি না, কথা জড়িয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন নিউমার্কেটের সমস্ত ভিড় উপেক্ষা করে হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললাম, চিনতে পারছেন ?

জেসমিন তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। মনে হলো চিনতে পারছে না।

ঐ যে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলাম রহমানের সঙ্গে ?

মনে আছে। মনে থাকবে না কেন ?

জেসমিনকে আজ আর সেদিনের মতো রূপসী লাগছিল না। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতো দেখাচ্ছিল। সাজগোজ মেয়েদের সম্ভবত অনেকটা বদলে দেয়। আমি অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললাম, অনেক দিন থেকেই আমি আপনাকে মনে মনে খুঁজছিলাম।

কেন ?

আপনার ছোট আপা কী বলল সেটা জানতে চাচ্ছিলাম।

ছোট আপা আবার কী বলবে ? কিসের কথা বলছেন ?

ঐ যে শাড়ি ছিঁড়ে গেল।

আপনি সত্যি সত্যি জানতে চান ?

হ্যাঁ, চাই।

আপা কিছু বলে নি। ওর অনেক শাড়ি। ছিঁড়ে গেলে কী আর হবে। ইচ্ছা করে তো ছিঁড়ি নি।

জেসমিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, শুধু এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে আপনি আমাকে খুঁজছিলেন ?

হ্যাঁ।

বাসায় গেলেন না কেন ? ১২১ নং মালিবাগ। বাসার সামনে একটা নারকেল গাছ আছে। রহমান ভাইকে জিজ্ঞেস করলেই ঠিকানা জানতে পারতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন ?

আমি কিছু বললাম না। জেসমিন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। আমার কিছু বলার ছিল না। কিংবা ছিল, বলতে পারলাম না। ঠিক সময়ে আমরা ঠিক কথাটি কখনো বলতে পারি না। ভুল কথাটা শুধু মনে আসে।

pathagar.net

চমৎকার লাগল লেবু-চা। আরেক কাপ খেতে ইচ্ছে করছে। করিম সাহেবকে দ্বিতীয় কাপের কথাটা বলা ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারছি না। তিনি হয়তো বিরক্ত হবেন।

জানালার পর্দা সরাতেই দেখলাম আচার-খাওয়া মেয়েটি স্কুলের জামা-কাপড় পরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এদের বাড়ির সামনে দিয়ে এতবার আসা-যাওয়া করি, কখনো তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয় না। একবার দেখা হলে বুঝতাম সত্যি সত্যি নীলিমার সঙ্গে এই মেয়েটির চেহারার মিল আছে কি-না। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি ? বত্রিশ বৎসরের একজন লোক তের-চোদ্দ বছরের একটি বালিকার মুখ দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাপারটা খুব হাস্যকর। মাঝে মাঝে আমরা সবাই বোধহয় এরকম উদ্ভট কিছু করি। আমি রাস্তায় নেমে এলাম। এত ভোরে মেয়েটি কোথায় যাচ্ছে ? মর্নিং শিফট স্কুল নাকি ?

আনন্দ বোর্ডিং হাউসের মালিক আমাকে দেখে বললেন, স্লামালিকুম ফরিদ সাহেব, কোথায় যান ?

নাশতা খাব। দেখি রেস্টুরেন্ট খুলেছে কি না।

আজ মনে হয় সকালে উঠেছেন ?

জি। আজ হাসপাতালে যাচ্ছি। গনি সাহেব, আপনার রেন্ট কত হয়েছে হিসাব করেন। দিয়ে যাব।

এখনই কেন ? মাস শেষ হোক, তারপর দেবেন।

অসুখটা ভালো না। হাসপাতাল থেকে নাও ফিরতে পারি।

গনি সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। এই লোকটিকে আমি বেশ পছন্দ করি। নির্বিরোধী ভালোমানুষ টাইপের লোক। এরকম মানুষ বোর্ডিংয়ের ব্যবসা করে টিকে আছে কীভাবে কে জানে!

ফরিদ সাহেব!

জি ?

এইরকম কথা বলা ঠিক না। আল্লাহ্ নারাজ হন। হায়াত-মউত মানুষের হাতে না। আল্লাহপাকের হাতে।

তা ঠিক। গনি সাহেব, আমার চিঠিপত্র রেখে দেবেন যদি আসে, আসবে না হয়তো।

জি আচ্ছা।

pathagar.net

আর শোনেন ভাই, আমি এখন যাচ্ছি, বারোটার দিকে ফিরব। আমার বন্ধু-বান্ধবদের আসার কথা, ওদের বসতে বলবেন। চাবিটা রাখেন।

গনি সাহেব বললেন, এক কাজ করেন, আমার রিকশা নিয়ে যান। নানান জায়গায় যাবেন, সুবিধা হবে। এখন রিকশা পাওয়া ঝামেলা। অফিস টাইম।

গনি সাহেবের রিকশাটির পেছনে বড় বড় করে লেখা— 'প্রাইভেট'। এটা যে সাধারণ ভাড়া-খাটা রিকশা নয় সেটা বোঝানোর জন্য এটা বানানোও হয়েছে অন্যরকমভাবে। দেখতে অনেকটা যাত্রাদলের সিংহাসনের মতো। চড়তে বড়ই অস্বস্তি লাগে। সবাই দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে।

রিকশায় উঠেই ঠিক করে ফেললাম কোথায় কোথায় যাব। প্রথমে যাব আমার অফিসে। যাওয়ার দরকার নেই, আগেই ছুটি নিয়ে এসেছি। তবু একবার যাব। বড় ভাইয়ের বাসায় যাব। আমার এক ছোট মামা থাকেন ইন্দিরা রোডে, তাঁর কাছে যাব। তিনি বলে রেখেছেন আমাকে কিছু টাকা দেবেন। অনুর ওখানে গেলে ভালো হতো কিন্তু এখন আর নারায়ণগঞ্জ যাবার সময় নেই। অনুর বরকে টেলিফোনে বলা হয়েছে। সে জানিয়েছে আসবে। পাঁচটার সময় সরাসরি হাসপাতালে আসবে।

প্রথমে যাওয়া যায় কোথায়? বড় ভাইয়ের বাসায়। তাঁর ছোট মেয়েটির জন্যে কিছু-একটা নেয়া দরকার। এই মেয়েটি আমার খুব ভক্ত। আমাকে চাচা ডাকে না, ডাকে ফরিদ মামা। মামাদের সঙ্গেই ওর যোগাযোগ বেশি, কাজেই সবাইকেই ভাবে মামা। মেয়েটির বয়স মাত্র চার বৎসর। কিন্তু অসম্ভব স্মৃতিশক্তি। তাকে যত উপদেশ দেওয়া হয় সব সে গম্ভীর হয়ে আমাকে শোনায়। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে এমনভাবে কথা বলে যে, বড় মায়া লাগে। যেমন— সে গম্ভীর হয়ে বলবে, ফরিদ মামা, টিভি বেশি দেখলে মাথা ধরে, চোখ খারাপ হয়। বেশি দেখা ভালো না। শুধু কার্টুন দেখতে হয়। কার্টুন দেখলে চোখ খারাপ হয় না। আর শোনো মামা, বাইরের মানুষের সামনে নেংটো হয়ে আসা খুব খারাপ। সবাই তখন মন্দ বলবে। আর বিছানায় পেশাব করাও খারাপ। আর পেশাব বলাও খারাপ। বলতে হয় বাথরুম। তোমার যদি পেশাব পায় তা হলে তুমি বলবে, বাথরুম পেয়েছে। তাই না মামা?

বড় ভাইকে বাসায় পাওয়া গেল না। তাঁর এক শালির গায়ে-হলুদ। দল বেঁধে সবাই গেছে নারিন্দা। আজ আর ফিরবে না। বিয়ের ঝামেলা চুকিয়ে ফিরবে। দু-তিন দিনের মামলা। মজিদের মা বলল, নারিন্দা যাইবেন ভাইজান?

না।

তয় বসেন। চা দেই, চা খান।

মজিদের মা কোনো-এক বিচিত্র কারণে আমাকে খুব পছন্দ করে। যখনই আসি আমার সেবা-যত্নের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। হয়তো আমার মতো দেখতে তার কোনো ছেলে ছিল। কোনোদিন জিজ্ঞেস করা হয় নি।

কোন শালির বিয়ে জানো মজিদের মা ?

মধ্যমটার, বেনু আফার।

বেনুকে ঠিক চিনতে পারলাম না। বড় ভাইয়ের অনেকগুলি শালি এবং সবাই বেশ রূপসী। প্রতিবছরই এদের কারো-না-কারো বিয়ে হচ্ছে। তবু সংখ্যায় কমছে না। এদের মধ্যে একজন ছিল দেবী প্রতিমার মতো। মুখের দিকে তাকালেই মন খারাপ হয়ে যেত। ভুরু, চোখ, সব যেন তুলি দিয়ে আঁকা।

আমি একদিন ভাবিকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, এই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন না ভাবি।

ভাবি রসিকতা বুঝতে পারলেন না। রেগেমেগে অস্থির হয়ে গেলেন।

কী দেখে তোমার কাছে বোন বিয়ে দেব ? কী আছে তোমার ? টাকা-পয়সা না থাকলে লোকজনের বিদ্যা-বুদ্ধি থাকে। চেহারা থাকে। তোমার কোনটা আছে ?

ঠাট্টা করছিলাম ভাবি।

না, ঠাট্টা তুমি করছ না। ঠাট্টা বোঝার বুদ্ধি আমার আছে। তুমি ওর কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাক, সেটা আমি জানি না ভাবছ ? ঠিকই জানি।

দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা। কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কথাটা ঠিক না। একদিন নিউমার্কেটের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন ভাবির এ বোনটির সঙ্গে দেখা। দু'-একটা কথাবার্তা বললাম এবং পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরী মহিলার মতো তার ধারণা হলো, আমি তার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এই গল্প সে করেছে ভাবির সঙ্গে।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। বড় ভাই একদিন হোস্টেলে এসে নানারকম ভণিতা করে বললেন, এখন পড়াশোনার সময়, বিয়ে টিয়ের কথা চিন্তা করা ঠিক না। পড়াশোনা আগে শেষ হোক। তা ছাড়া দুই ভাইয়ের এক বাড়িতে বিয়ে করা ঠিক না। নতুন আত্মীয় করা দরকার। মহা ঝামেলা!

একবার গিয়ে দেখলে হয় না, কোন মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে ? নারিন্দা খুব একটা দূর কি ? রিকশা তো আছেই।

রোদে কোনো তেজ নেই। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। আজও বোধহয় ঝড়-বৃষ্টি হবে। এ বৎসর খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। রিকশাওয়ালা বলল, এখন কুন দিকে যাইবেন?

মগবাজার চল। ওয়ারলেস অফিস।

এই রিকশাওয়ালা প্রফেশন্যাল নয়। চালাতে পারছে না। ঘামে নেয়ে উঠেছে। উৎসাহেরও বেশ অভাব। চলছে ঢিমে তেতালা ছাঁদে। তাকে দেখে মনে হয় না সে কোনোদিন মগবাজারে পৌঁছবে।

জেসমিন তো বাসায় নেই। আপনি কে?

সত্যিই তো আমি কে? বুড়ো ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। উনি নিশ্চয়ই জেসমিনের বাবা। এই দুপুরবেলা ঘামতে ঘামতে আমি উপস্থিত হয়েছি। সঙ্গত কারণেই ভদ্রলোক শঙ্কিত বোধ করছেন।

আপনি কে? জেসমিনকে কী জন্য দরকার?

সত্যি তো, ওকে আমার কী জন্য দরকার? আমি থেমে থেমে বললাম, আমি খুব অসুস্থ। আজ আমি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি। আমার তলপেটে একটা অপারেশন হবে।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমাকে দেখছেন।

জেসমিনকে খবরটা দেবেন দয়া করে।

তা দেব, কিন্তু আপনার নাম কী? পরিচয় কী? জেসমিনকে কীভাবে চেনেন?

দেবার মতো কোনো পরিচয় আমার নেই। আমার নাম ফরিদ।

এই নাম বললে জেসমিন আপনাকে চিনবে?

জানি না। চিনতেও পারে।

আপনার অসুখটা কী?

ক্যানসার। ডুওডেন্যাল ক্যানসার।

ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি হাসতে চেষ্টা করলাম।

pathagar.net

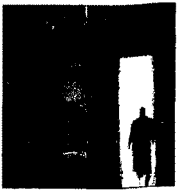

বাসায় ফিরলাম একটার দিকে। বন্ধুরা কেউ আসে নি তখনো। গনি সাহেব এসে একটি রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেলেন। বাবুল ভাইয়ের চিঠি। ইংরেজিতে লেখা। যার অর্থ অনেকটা এরকম— বাবার অনেকগুলি চিঠি পেয়েছি। বুঝতে পারছি তোমাদের অবস্থা শোচনীয়। কিছু করতে পারছিলাম না। আমার নিজের অবস্থাও তাই। এখন অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। ড্রাফট একটা পাঠালাম। বেশ কিছু টাকা এতে হবার কথা। পরবর্তী সময়ে আরো পাঠাব। ধীরে ধীরে দোতলা একটি বাড়ি বানিও, যার একতলাটি ভাড়া দিয়ে বাবা যেন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার নিজের আর দেশে ফেরা হবে না। তবে বাচ্চাদের একবার বাংলাদেশ দেখাতে নিয়ে আসব। ড্রাফটটি তাড়াতাড়ি ভাঙাবার চেষ্টা করবে। ডলারের দাম পড়ে যাবে এরকম একটি গুজব এখানে আছে।

তিন হাজার পাঁচশ' ইউএস ডলারের একটি ড্রাফট। গনি সাহেব বললেন, ঠিকমতো ভাঙাতে পারলে লাখখানিক টাকা হবার কথা।

আমি চুপ করে রইলাম। যে-কোনো চিঠি মানুষ দু-তিনবার করে পড়ে। এই চিঠি দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না। এবং চিঠি খুব অবহেলার সঙ্গেই রাখলাম টেবিলে, যেন টাকাটার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

গনি সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন আমি খানিকটা উচ্ছ্বাস দেখাব। দেখানোই তো স্বাভাবিক।

কেউ কি এসেছিল আমার কাছে?

আপনার ভগ্নিপতি এসেছিলেন। খানিকক্ষণ বসে চলে গেছেন।

কিছু বলে গেছেন?

জি-না।

কিছুই বলে যান নি?

না। শুধু বললেন, উনি আপনার ভগ্নিপতি।

দায়িত্ব পালনের দেখা। এর বেশি কিছু না। মুখ কালো করে বসেছিলেন এবং প্রতি মুহূর্তেই হয়তো বিরক্তি বাড়ছিল। বাড়ি ফিরে হয়তো অনুর সঙ্গে বড়

রকমের একটা ঝগড়া বাঁধিয়েছেন। তিনি হয়তো বলেছেন, তোমার ভাইয়ের খোঁজে গিয়ে সারাটা দিন নষ্ট হলো। অনু তার উত্তরে বলল, গিয়েছিলে কেন ? তোমাকে যেতে বলেছি ? অনু খুব শান্তমুখে কাটা-কাটা কথা বলতে পারে। এবং এত সহজে পুরনো সব কথাবার্তা তোলে যে মনে হয় রাত-দিন সে এসব নিয়েই ভাবে। এমন তিক্ততার মধ্যে দু'জন মানুষ বাস করে কীভাবে ?

অনুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই মন ভার করে ফিরে আসতে হয়। মনে হয় বেঁচে থাকার মতো শাস্তি আর নেই। অনু শান্তমুখে সহজ গলায় বলে, আমি এভাবে বেশি দিন থাকব না। এ কথায় সে কী বুঝাতে চায় আমি জানি না। জানতে চেষ্টাও করি না।

একদিন-না-একদিন চলে যাব।

কোথায় চলে যাবি ?

তাও তো ঠিক। আমার যাবার জায়গা নেই।

অনুকে বাড়িতেই থাকতে হবে। তার কোথাও যাবার জায়গা নেই, এই চিন্তাটিই কি তাকে সব সময় পীড়িত করছে ?

হাত-পা কুটকুট করছিল। গা ধোয়ার জন্যে বাথরুমে গিয়ে দেখি মাকড়সাটা বেরিয়ে এসেছে। শেষ দেখা দিতে এসেছে নাকি ? আমি বেশ শব্দ করে বললাম, কী-রে ব্যাটা, কেমন আছিস ? বলাটা ঠিক হলো না, কারণ এটা মেয়ে-মাকড়সা, এর পেটের নিচে ডিমের থলি। একে বলা উচিত— কী-রে মা, কেমন আছিস ? কিন্তু এমন কুৎসিত জিনিসকে মা ডাকা যায় না। আমি ওর গায়ে পানি ছিটিয়ে দিলাম। সে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তার কোনো গোপন জায়গায় লুকিয়ে পড়ল। আমাদের দুজনের বিদায়ের দৃশ্যটি ঠিক সুখকর হলো না। পানি না দিলেই হতো।

শরীর এখন বেশ ভালোই লাগছে। বাথরুমের আয়নাটা ভালো না। কেমন ঢেউ-খেলানো ছবি আসে, তবু নিজেকে খারাপ লাগছে না। এ মুখ ভরসা-হারানো লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের একটি নয়। ঠিক বললাম কি ? নাকি নিজেকে এই মুহূর্তে বিশেষ কিছু ভাবছি ? যেন আমি সবার চেয়ে আলাদা ?

আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে বাবুল ভাই-ই ছিল একটু অন্যরকম। তার এক ফোঁটা সাহস ছিল না, তবু সে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব সাহসী কাণ্ডকারখানা করত। মোজাম্মেল স্যারের সঙ্গে যে কাণ্ডটা করল! স্যার ক্লাসে অঙ্ক করাচ্ছেন, সে উঠে বলল, স্যার, মনিরকে আপনি হাফইয়ারলির অঙ্ক প্রশ্ন আউট করে দিয়েছেন কেন ? মোজাম্মেল স্যার রাগের চোটে তোতলা হয়ে গেলেন। চোখ-মুখ লাল করে বললেন, আ... আ... আমি... কোশ্চেন আউট করেছি ? বলেছে কে ?

মনির বলেছে স্যার।

কথাটা খুবই সত্যি। মনির সব সাবজেক্টে গোল্লার কাছাকাছি পেয়েছে, শুধু অঙ্কে পেয়েছে বিরানব্বই। তবু মোজাম্মেল স্যার বাবুল ভাইকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেললেন। দু-তিনজনে মিলে তাকে বাসায় দিয়ে গেল। বাসায় বাবা দ্বিতীয় দফায় তার উপর চড়াও হলেন। শিক্ষককে অপমান! তোর বাপের নাম আজ ভুলিয়ে ছাড়ব। বাপের নাম তিনি ভোলাতে পারলেন না, তবে দিন সাতেকের জন্যে বিছানায় ফেলে দিলেন।

গা-টা ফুলে প্রচণ্ড জ্বর। বাবুল ভাই রাত-দিন শুয়ে থাকে। এক রাতে বিড়-বিড় করে কী-সব বলতে লাগল। বাবা গিয়েছেন পাশের বাড়ি তাস খেলতে। বড় ভাই তাঁকে ডাকতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে এলেন। আমার কেন জানি ধারণা হলো, বাবুল ভাই বাঁচবে না। এবং আশ্চর্য, এই ভেবে সূক্ষ্ম একটা আনন্দ বোধ করলাম। সে মরে গেলেই ভালো হয়। বাবার একটা উচিত শিক্ষা হয়।

বাবাকে উচিত শিক্ষা দেয়া গেল না। বাবুল ভাই সেরে উঠল। বাবা তাকে মোজাম্মেল স্যারের বাসায় নিয়ে গেলেন। বাবুল ভাই পা ধরে বলল, স্যার, আর কোনোদিন করব না। মাফ করে দেন স্যার। রীতিমতো নাটক। বাবা সে-রাতে ভাত খেতে খেতে বললেন, শিক্ষকের অমর্যাদা করলে বড় হতে পারবি না। শিক্ষক বড় মারাত্মক জিনিস। বাবা-মা'কে একবার সালাম দিলে হয়, কিন্তু শিক্ষককে সালাম দিতে হয় দশবার, বুঝলি?

আমরা কেউ কোনো জবাব দিলাম না। বাবুল ভাই জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখতে লাগল। বাবা হৃষ্টচিত্তে বলতে লাগলেন, কোশ্চেন আউট করে সে খুব খারাপ কাজ করেছে, কিন্তু তোরা তো অঙ্ক শিখছিস তার কাছে। শিখছিস না? সেটাই বড়।

তার দিনকয়েক পর মোজাম্মেল স্যার বাবুল ভাইকে ডেকে নিয়ে বললেন, তুই এক কাজ করিস, সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় আমার বাসায় আসিস, অঙ্কটা দেখিয়ে দেব। টাকাপয়সা কিছু দিতে হবে না। বলিস তোর বাবাকে।

বাবুল ভাই রাজি ছিল না। কিন্তু বাবা বিনা পয়সায় সুযোগ হারাবার লোক নন। তিনি কড়া ধমক দিয়ে বাবুল ভাইকে পাঠাতে লাগলেন।

মোজাম্মেল স্যার অঙ্ক খুবই ভালো জানতেন। স্কুলে তাঁর নাম ছিল মুসলমান যাদব। বাবুল ভাই তাঁর কাছ থেকে ভালো অঙ্ক শিখলেন। ভালো বললে কম বলা হবে। খুবই ভালো।

আমার হাসপাতাল জীবন শুরু হলো।

সোমবার বিকাল চারটায় রহমানের জোগাড়-করা জিপে চড়ে এলাম হাসপাতালে। এই জীবন দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছে। এখন যেমন খারাপ লাগছে এক সময় তেমন খারাপ লাগবে না। ফিনাইলের গন্ধও আপন মনে হবে। ডাক্তারদের সঙ্গে পরিচয় হবে। নার্সদের কেউ কেউ হাসপাতালের গল্প শুনিয়ে যাবে। যে সুইপার বাথরুম পরিষ্কার করতে আসবে তাকে হয়তো আমি নাম ধরে ডাকব।

মনসুর খুব উৎসাহ প্রকাশ করতে লাগল— ভালো ঘর, কেমন হাওয়া দেখছিস নাকি? ফাসক্লাস।

ঘরটি ভালোই। পেছনে এক চিলতে বারান্দা। দাঁড়ালে শিশু পার্ক দেখা যায়। সে দিকটা বড় সবুজ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লাগে।

এই ফরিদ, অ্যাট্যাচড্ ইংলিশ বাথরুম।

বাথরুম খুলেই মনসুর মহা উল্লসিত। ভাবখানা এরকম যেন ইংলিশ বাথরুম ছাড়া আমি বাথরুম করতে পারি না।

ফরিদ, ময়লা আছে, সুইপার দিয়ে ক্লিন করিয়ে দেব। পাঁচটা টাকা খাওয়াতে হবে। ফ্লাস্ক খোল্, চা খাওয়া যাক।

রহমান বলল, আমি খাব না। আমার বমি-বমি আসছে। হাসপাতালের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। মনসুর দাঁত বের করে হাসল— হাসপাতালে ফুলের গন্ধ থাকবে নাকি রে শালা? হাসপাতালে থাকবে ওষুধের গন্ধ, রোগের গন্ধ। যেখানকার যা নিয়ম। এর মধ্যেই মনসুর আবিষ্কার করল, ফ্যানের রেগুলেটরটা খারাপ, ধরলেই শক দেয়। বাথরুমের ফ্লাশ কাজ করে না। দরজার ছিটকিনি কাজ করে না। সে নোটবই বের করে লিখে ফেলল। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই নাকি সে সব ঠিক করে ফেলবে। টাকা খাওয়াতে হবে। টাকা খাওয়ালেই সব ঠিক। টাকাটা সে কাকে খাওয়াবে কে জানে! আমি বললাম, আরেকজন রোগী থাকার কথা না?

রোগীর বিছানা-বালিশ সবই আছে, রোগী নেই। মনসুর গম্ভীর হয়ে বলল, রুমমেট যাকে পেয়েছিস, মালদার পার্টি। জিনিসপত্র দেখ-না। থার্মোফ্লাস্কটা দেখেছিস ? মিনিমাম এক হাজার টাকা দাম।

রহমান সত্যি সত্যি অস্বস্তি বোধ করছে। দুবার বলল, ফিনাইলের গন্ধে তার মাথা ধরে যাচ্ছে। কিন্তু মনসুরের ওঠার কোনো তাড়া দেখা গেল না। সে রোগী সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেল। সেই সঙ্গে একজন আয়া নিয়ে আসবে, যে নাকি সব দেখেশুনে রাখবে। এটা-সেটা এনে দেবে। অসুবিধা হলে রাত-বিরেতে ডাক্তারকে খবর দেবে। মনসুর বিজ্ঞের মতো বলল, হাসপাতাল কি ডাক্তাররা চালায় ? হাসপাতাল চালায় আয়ারা। একজন ভালো আয়া পাওয়া নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। রহমান বিরক্ত হয়ে বলল, ছেলেদের ওয়ার্ডে আয়া আসতে দেবে নাকি ? কী যে সব কথাবার্তা!

আয়া নয়, একজন বেঁটে ছোকরাকে সে ধরে নিয়ে এলো। খুব নাকি ওস্তাদ। ছোকরার নাম মঞ্জু মিয়া।

নতুন জীবন শুরু হলো।

আমার পাশের বেডের রোগীর নাম জুবায়ের। আনকমন নাম। ভদ্রলোকও বেশ আনকমন। দারুণ ফরসা এবং দারুণ রোগা। লম্বাও প্রায় ছ'ফুটের মতো। যখন শুয়ে থাকেন তখন কেন জানি সাপের মতো লাগে। সাপের উপমাটি ঠিক হলো না। সাপের মধ্যে একটা ঘিনঘিনে ব্যাপার আছে। একটা গতি আছে। এর মধ্যে তা নেই। এর চারদিকে একটা আলস্যের ভাব আছে। রোগের জন্যেই হয়তো। বয়সও ধরা যাচ্ছে না, পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে। রোগা মানুষের বয়স ধরা যায় না। ভদ্রলোক কথা বলেন খুবই কম। আমি যখন বললাম, আমি আজ বিকেলে এসেছি। আপনি অন্য কোথাও ছিলেন, আপনার সঙ্গে সে জন্যেই দেখা হয়নি। আমার নাম ফরিদ। তিনি শুধু বললেন, আমার নাম জুবায়ের। আর কোনো কথা হলো না।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার পর ভদ্রলোকের স্ত্রী এলেন। তিনি আমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন— এ অ্যানি, আমার স্ত্রী।

অ্যানি নামের মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন। নরম স্বরে বললেন, আপনাকে কিন্তু ও খুব জ্বালাবে। রাত জেগে বই পড়বে। আগে যে রোগীটি ছিল সে রোজই কমপ্লেইন করত।

আমি করব না। কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

কেন ? আপনি সন্ন্যাসী ?

মেয়েটির মুখ হাসি-হাসি। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। উত্তর জানতে চায় হয়তো।

কী, বলুন ? আপনি কি সংসার-বৈরাগী ?

জি-না।

সন্ন্যাসী হওয়া ঠিক না। রাগ, ঘৃণা, অভিমান, অভিযোগ এসব থাকা উচিত। এসবের দরকার আছে।

মেয়েরা এত গুছিয়ে কথা বলতে পারে তা জানা ছিল না। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলার বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হবে না। কালো রঙ। মাথা-ভর্তি চুল, বেণী করা নেই, পিঠময় ছড়িয়ে দেয়া। এর দিকে তাকিয়ে বলে দেয়া যায়— অনেক ছেলে এই মেয়েটির প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি এদের সবাইকে ছেড়ে ফরসা ও রোগা লোকটির কাছে এসেছে। এসেছে কেন ? কী আছে লোকটির মধ্যে ?

অ্যানির অন্য সব প্রেমিকদের আমার দেখতে ইচ্ছে করল। মেয়েটি বসেছে বিছানার পাশে। কথা বলছে মৃদু স্বরে। কিন্তু কথা বলছে সে একাই। লোকটি শুধু শুনে যাচ্ছে। এমনকি হ্যাঁ-হুঁ পর্যন্ত বলছে না। শুয়ে শুয়ে ওদের কথা শোনা ঠিক হচ্ছে না। আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ বড় বারান্দা। রোগী দেখতে আসা লোকজনরা হাঁটাহাঁটি করছে। একটা লাল স্যুয়েটার-পরা বাচ্চা টুকটুক করে দৌড়াচ্ছে। এই গরমে তাকে স্যুয়েটার পরিয়েছে কেন কে জানে! আমি ডাকলাম— এই খোকা, এই! ছেলেটি অবাক হয়ে আমাকে দেখল, তারপর খেলতে লাগল নিজের মনে। শিশুদের মন পাওয়া খুব কঠিন। অ্যানি বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এলো।

ফরিদ সাহেব! যান, ভেতরে যান। আমরা এমন কিছু বলি না যে অন্য কেউ শুনতে পারবে না। আপনি শুধু শুধু কষ্ট করে বাইরে এলেন।

ওর চোখ ভেজা। কাঁদছিল হয়তো।

অনেক দিন ধরে সে আর কথা বলে না, শুধু শোনে। কথা বলি আমি একা। আচ্ছা, আজ চলি।

ওনার কী হয়েছে ?

কী হয়েছে শুনে কী করবেন ? ও মারা যাচ্ছে।

ভদ্রলোক রাত একটা পর্যন্ত বই পড়লেন। আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। কেন জানি খুব ক্লান্ত লাগছে। এই অপরিচিত জায়গায় আমার ঘুম আসার কথা নয়, তবু আজ বোধহয় ঘুম আসবে। ভদ্রলোক বাতি নিবিয়ে নরম স্বরে ডাকলেন, ফরিদ সাহেব!

বলুন।

ঘুমান নি ?

Pathagar.net

জি-না। নতুন জায়গায় ঘুম আসে না।

আমারও আসে না। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন, হাসপাতালের প্রথম রাতে আমি মরার মতো ঘুমিয়েছিলাম। ওষুধপত্র ছাড়াই দীর্ঘ ঘুম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ফরিদ সাহেব, আপনারও কি ঘুম পাচ্ছে?

জি।

ঘুমাবেন না। কষ্ট করে হলেও জেগে থাকেন। হাসপাতালের অনেকরকম কুসংস্কার আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে— যে হাসপাতালের প্রথম রাতে আরাম করে ঘুমায় সে আর হাসপাতাল ছেড়ে জীবিত অবস্থায় বের হয় না।

তাই নাকি?

এই কুসংস্কারটা আগে জানতাম না। জানলে আমি জেগে থাকতাম।

ভদ্রলোক অন্ধকারের মধ্যেই হাসলেন। যিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কোনো কথা বলেন নি তিনি আমার সঙ্গে এত কথা বললেন কী জন্য?

ফরিদ সাহেব!

জি?

আপনার সঙ্গে সিগারেট আছে?

জি, আছে।

দিন একটা। আমার খাওয়া নিষেধ, কিন্তু এখন খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনার কি ঘুম পাচ্ছে নাকি?

মনে হয় পাচ্ছে।

ঘুমাবেন না, উঠে বসুন। ভুল করবেন না।

কুসংস্কারটাকে আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন। সিগারেটের আলো এক-একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। তাঁর ফরসা মুখ দেখা যাচ্ছিল। এত ফরসাও মানুষ হয়!

ফরিদ সাহেব!

বলুন।

অ্যানির সঙ্গে আমার ক'দিন হয় বিয়ে হয়েছে বলুন তো?

বলতে পারব না।

অনুমান করুন।

দু' বছর?

Pathagar.net

না। তিন মাস। আমি নিজে আমার অসুখের কথাটা জানি। কিন্তু সেটা গোপন করেই ওকে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু কিছু-কিছু মেয়ে থাকে ফরিদ সাহেব, যাদের জন্যে যে-কোনো ধরনের অন্যায় করা যায়।

তা ঠিক।

আমি অবশ্যি বিয়ের পরই অ্যানিকে সব খুলে বলি। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, সে রাগ করে নি।

হয়তো রাগ করেছে, আপনাকে বুঝতে দেয় নি।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, দেখি, আরেকটা সিগারেট দিন।

আর খাবেন না।

এখন সিগারেট খাওয়া না-খাওয়া আমার কাছে সমান।

আমি আরেকটি সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম।

ফরিদ সাহেব!

বলুন।

ঘুম আসছে?

হ্যাঁ।

ঘুমাবেন না। কুসংস্কার হোক যাই হোক, ঘুমাবেন না।

ঠিক আছে, ঘুমাব না।

আপনি যে বললেন সে রাগ করেছে এটা ঠিক না। রাগ করলে ঠিকই বুঝতে পারতাম। অসুস্থ অবস্থায় মানুষের সেন্সিটিভিটি বেড়ে যায়। সে ছোট ছোট ব্যাপারগুলিও ধরতে পারে।

তাহলে হয়তো রাগ করেন নি।

না, করে নি।

ভদ্রলোক বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গেলেন। ফিরে এলেন অনেকক্ষণ পর। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার নয়। বারান্দায় বাতি জ্বলছে। তার আলোয় ঘরের ভেতরটাও আলোকিত। আবছা করে হলেও সবকিছু চোখে পড়ে। আমি বললাম, আপনি জেগে আছেন কেন? আপনি শুয়ে পড়ুন।

হ্যাঁ, শুয়ে পড়ব। ঘুম আসছে। তবে একটা কথা শোনেন— জীবনের উপর আমার একটা রাইট আছে। আছে কি-না?

হ্যাঁ, আছে।

যাকে ভালোবাসি তাকে যদি একদিনের জন্যেও পেতে চাই তা হলে সেটা কি খুব অন্যায়?

Pathagar.net

না, অন্যায় নয়।

আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এটা বলেছেন। কিন্তু আপনি মনে মনে এটাকে অন্যায় ভাবছেন।

না, তা ভাবছি না।

আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি কারো সান্ত্বনা চাই না। এসবের আমার দরকার নেই।

আমি চুপ করে গেলাম। ভদ্রলোক শুয়ে পড়লেন। এবং বোধহয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

হাসপাতালের নিজস্ব কিছু ব্যাপার আছে। সে কখনো ঘুমায় না। দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে থাকে। এখন রাত বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা। বারান্দায় কাদের কথা শোনা যাচ্ছে, হাসির শব্দও শুনলাম। রোগীদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়স্বজনরা হাঁটাহাঁটি করে।

রোগীদের কেউ কেউ কাঁদে। ব্যথায় কাঁদে কিংবা ভয়ে কাঁদে। আয়ারা খাবারের ভাগ নিয়ে দুপুররাতে ঝগড়া করতে বসে।

কম বয়সী ইন্টার্নি ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে রসিকতা করতে করতে বারান্দা দিয়ে হাঁটেন।

কোনো-একটি সময়ে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। রেসিডেন্ট সার্জন আসেন। নার্সরা ছোটাছুটি করতে থাকে। অপারেশন টেবিলে রোগীকে নিয়ে যাবার জন্যে ঘুম-ঘুম চোখে স্ট্রেচার হাতে অ্যাটেনডেন্টরা। এনেসথেসিয়া যিনি করবেন তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

রেসিডেন্ট সার্জন ধৈর্য হারিয়ে চেঁচাতে থাকেন।

ঘুম চটে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে কত রকম শব্দ শুনলাম। সব অচেনা শব্দ। এই বিচিত্র শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে কত দিন লাগবে কে জানে!

হাসপাতালের খাবারদাবার খুব খারাপ হয় বলে জানতাম। সকালের নাশতা আমার ভালোই লাগল। এক পিস মাখন লাগানো রুটি, একটি সেদ্ধ ডিম, একটা কলা।

পাশের বেডের ভদ্রলোক ঘুমাচ্ছেন। তাঁর নাশতা ঢাকা পড়ে রইল। তিনি ঘুম থেকে উঠলেন ন'টার দিকে এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড একটি টিফিন ক্যারিয়ারে করে তাঁর জন্যে খাবার এলো।

ফরিদ সাহেব!

জি?

আপনি কি নাশতা করে ফেলেছেন ?

হ্যাঁ।

এর পর থেকে করবেন না। অ্যানি সব সময় দুজনের জন্যে খাবার পাঠায়। আজ যখন সে আসবে আপনি তাকে বলে দেবেন কী কী জিনিস আপনার পছন্দ।

ভদ্রলোকের সঙ্গে সারা দিন আমার আর একটি কথাও হলো না। যেন তিনি আমাকে চেনেন না। একটি বই মুখের সামনে ধরে রইলেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, কী পড়ছেন ?

থ্রিলার।

কথাটা বলেই এমনভাবে তাকালেন, যার অর্থ হচ্ছে আমাকে বিরক্ত করবেন না।

দুপুরের পর থেকে চারদিক অন্ধকার করে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। বেশ ভালো ঝড়। আজ কোনো ভিজিটর আসবে না। এমন দিনে ঘর থেকে কেউ বেরুবে না।

আজ অবশ্য কারোর আসর কথা নয়। তবু কেউ কেউ হয়তো আসতে চাইবে। পিছিয়ে যাবে ঝড় দেখে। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমাকে দেখতে আসার কেউ নেই।

আশ্চর্য, যার কথা কখনো ভাবি নি সেই দুলাভাই এসে পড়লেন। দুলাভাই বলাটা ঠিক হচ্ছে কি-না কে জানে! বড় আপা মারা গেছেন সেই কবে! এর মধ্যে তিনি বিয়ে টিয়ে করে ঘর-সংসার শুরু করেছেন। পুরনো আত্মীয়তা বা সম্পর্কের কিছুই তো এখন নেই।

pathagar.net

ফরিদ, কেমন আছ ?

ভালো আছি।

দুলাভাই বেশ কিছু কলা নিয়ে এসেছেন। সেগুলি থেকে টুপটুপ করে পানি পড়ছে। তাঁর গা বেয়েও জল ঝরছে।

গামছা দিয়ে গা মুছে ফেলুন। অসুখ করবে।

না, কী অসুখ করবে!

তিনি সাবধানে কলাগুলি বেডের নিচে রাখলেন। মুখে কিছু বললেন না। তাঁর স্বভাব বেশি বদলায় নি। তাঁকে আগের মতোই ভাবুক মনে হলো।

খবর পেয়েছেন কার কাছে দুলাভাই ?

তোমার বন্ধু মনসুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ও।

অপারেশন ডেট দিয়েছে ?

জি-না।

টাকা-পয়সা লাগবে ফরিদ ?

জি-না, লাগবে না। আপনি চলে যান দুলাভাই, ঠাণ্ডা লাগবে।

এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যাব কোথায় ? বসি খানিকক্ষণ।

ফ্লাস্কে চা আছে, খাবেন ?

না, চা খাই না। গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে।

দুলাভাই খুব সাবধানে শার্টের ভেতরের পকেট থেকে একটা মুখবন্ধ খাম বের করে আমার বালিশের নিচে রেখে দিলেন।

কী রাখলেন ?

তেমন কিছু না।

এটা দুলাভাইয়ের আজ নতুন কিছু না। আগেও অনেকবার এরকম হয়েছে। হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে হয়তো মেসে এসেছেন। চুপচাপ বসে থেকেছেন কিছুক্ষণ। যাবার সময় লজ্জিত ভঙ্গিতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট রেখে দিয়েছেন টেবিলের উপর।

টাকা লাগবে না। টাকা কী জন্যে ?

চা-টা খাও বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে, বেশি কিছু তো না। সেই সামর্থ্যও নাই।

তিনি এসব কি তাঁর মৃতা স্ত্রীর স্মরণে করেন ? কী জানি! মানুষের কত রকম বিচিত্র স্বভাব থাকে! সব মানুষই অবশ্যি বিচিত্র। একজনের সঙ্গে অন্যজনের কিছুমাত্র মিল নেই। সেজন্যেই কি একজনের মধ্যে অন্যজনের ছায়া দেখলে আমরা এমন চমকে উঠি ? অসংখ্যবার বলি, আজ নিউমার্কেটে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা— অবিকল সালামের মতো। ঠিক সেইরকম হাঁটার ভঙ্গি।

দুলাভাই খোলা জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছেন। কবি-সাহিত্যিকরা বোধহয় এভাবে তাকায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে ওঠে। দুলাভাইয়ের যেমন হয়েছে। আমি বললাম, দুলাভাই, আপনার বাচ্চারা ভালো ?

হুঁ।

এই প্রশ্নটি কি আমি তাঁকে দ্বিতীয়বার করলাম ? আমার মনে হতে লাগল একটু আগে এই প্রশ্নটি করা হয়েছে। যখন কথা বলার কিছু থাকে না তখনই আমরা ঘুরেফিরে একই প্রশ্ন করি।

দুলাভাই, আপনি কিছু মনে না করলে একটা সিগারেট খাই।

আরে ছি-ছি, খাও। এই বয়সে মুরুব্বি দেখলে চলে ? খাও। কোনো অসুবিধা নেই।

সিগারেট ধরাতে আমার সঙ্কোচ হতে লাগল। কাজটা অন্যায়। মনে হতে লাগল কাজটা অন্যায়। সাদাসিধা ধরনের যে মানুষটি আমার সামনে বসে আছে তাকে আরো খানিকটা সম্মান আমার করা উচিত।

আশ্চর্য, এই দীর্ঘদিনে একবারও কেন তাঁর খোঁজখবর করি নি ? কেন একদিনও তাঁর বাসায় উপস্থিত হয়ে বলি নি, আপনাকে দেখতে এলাম দুলাভাই। ভালো আছেন তো ?

কেমন করে দুলাভাই তাঁর নতুন সংসার সাজিয়েছেন ? হঠাৎ বড় দেখতে ইচ্ছে করল। দুলাভাই বললেন, যাই, কেমন ? বৃষ্টি কমেছে।

আমি মৃদু স্বরে বললাম, যদি অসুখ সারে তা হলে প্রথমেই যাব আপনার বাসায়। দুলাভাই হাসলেন। হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস না করারই কথা। কেউ কথা রাখে না, আমিও নিশ্চয়ই রাখব না। তবু তাঁর তাতে মন খারাপ হবে না। আবারও কোনোদিন আমাকে দেখতে আসবেন। সঙ্কুচিতভাবে একটা ময়লা পঞ্চাশ টাকার নোট আমার বালিশের নিচে রেখে দেবেন।

দুলাভাই চলে যাবার পর দীর্ঘ সময় আমার মন-খারাপ থাকল। কেন বলতে পারি না। অত্যন্ত সাধারণ কিছু মানুষ আছে যারা অন্যদের উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে। খুবই ক্ষণস্থায়ী প্রভাব, তবু তার ক্ষমতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

মনসুর এসে উপস্থিত হলো সন্ধ্যাবেলা। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার মিনিট পাঁচেক বাকি। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আসবার দরকারটা কী ছিল ?

আসতাম না। রীনা বলল, ঠাণ্ডার মধ্যে চা-টা খেতে ইচ্ছা হবে। ফ্লাস্কটা দিয়ে এসো। চা দিয়েছে ফ্লাস্কে করে।

ফ্লাস্ক তো আমার একটা আছে। রহমান দিয়ে গেল না ?

সারছে। আমি আবার একটা কিনলাম।

মনসুর চা ঢালল। পাশের ভদ্রলোককে চা সাধল। তিনি শীতল কণ্ঠে বললেন, চা খাব না।

দোকানের চা না, ঘরের চা। খান এক কাপ। ঠাণ্ডার মধ্যে ভালো লাগবে। তেজপাতা দেয়া আছে।

থ্যাংক য়্যু, আমি চা খাব না।

আপনার অসুখটা কী ?

অসুখ নিয়ে আমি কারো সঙ্গে ডিসকাস করি না। কিছু মনে করবেন না।

pathagar.net

না না, ঠিক আছে।

মনসুর থাকল সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। সে কথা না বলে এক সেকেন্ডও থাকতে পারে না। সাতটা পর্যন্ত সে ক্রমাগত কথা বলে আমার মাথা ধরিয়ে দিল। আমি বললাম, এখন বাড়ি যা মনসুর।

এত সকাল-সকাল বাড়ি গিয়ে করব কী?

বউয়ের সঙ্গে গল্প করবি।

দেখি, যাব। আরেকটু বসি। এমন করছিস কেন?

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে, এখন যা।

মনসুর তবু বসেই রইল। সম্ভবত তার যেতে ইচ্ছে করছে না। তার স্বভাবই এরকম, কোথাও গেলে কিছুতেই উঠতে চাইবে না। বিয়ের পরও সে স্বভাবের তেমন পরিবর্তন হয় নি।

ফরিদ, উঠি? কাল রীনাকে নিয়ে আসব।

আসতে হবে না।

হবে না কেন? আজই আসতে চেয়েছিল। বৃষ্টির জন্যে আনি নি।

আমি মনসুরকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে তার শ্বশুরবাড়ির প্রসঙ্গ নিয়ে এলো। তার এক মামাশ্বশুর নাকি তাকে কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করেছেন— তার ফ্রিজ আছে কি-না। এই কথা ক'টি সে বলল নিচু গলায়। এমন কী রহস্যময় কথা যে ফিসফিস্ করে বলতে হবে? মনসুর বলল, এটা কেন জিজ্ঞেস করল বুঝতে পারছিস?

না।

একটা ফ্রিজ কিনে দেবে আর কি।

বলিস কী!

আরে, ওদের কি আর অভাব আছে?

সুখী মানুষের মতো হাসিমুখে নিচে নামতে লাগল মনসুর। তার মনে কি কোনো দুঃখ নেই? সে কি সত্যি সত্যি একজন পরিতৃপ্ত সুখী মানুষ।

আমি মনসুরকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ঘরে এসে দেখি একজন বুড়ো ভদ্রলোক এসেছেন আমাদের ঘরে। আমার রুমমেটের বাবা। অবিকল একরকম চেহারা। বাবা ও ছেলের মধ্যে এমন মিল সচরাচর দেখা যায় না। তাঁরা কথা বলছেন নিচু স্বরে। আমি বুড়ো ভদ্রলোককে সালাম-টালাম কিছু দিতাম। কিন্তু তিনি একবারও ভালো করে তাকালেন না আমার দিকে।

আমি বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে বসে রইলাম। একজন প্রফেসর সাহেব সম্ভবত রাউন্ড দিতে বের হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে তিনজন ছাত্র, একজন নার্স।

pathagar.net

প্রফেসর সাহেবকে খুব মেজাজি মনে হলো। যাকে দেখছেন তাকেই ধমকাচ্ছেন। আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

আপনি কি রোগী?

জি।

বাইরে বসে আছেন কেন?

এমনি বসে আছি।

যান, ঘরে যান।

ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। প্রফেসর সাহেব বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে আগুন-চোখে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। বুড়ো ভদ্রলোক নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, আপনার ওপেনিংয়ের ডেট দিয়েছে?

আমি তাঁর কথা বুঝতে পারলাম না।

অপারেশনের ডেট হয়েছে কি-না?

জি-না।

প্রিলিমিনারি টেস্ট?

এখনো কিছু হয় নি।

সে কী!

আমি মাত্র গতকাল এসেছি।

তাতে কী, চব্বিশ ঘন্টা তো পার হলো। এই যে ইয়ং ডক্টরস, তোমরা করছ কী?

ইন্টার্নি ডাক্তাররা নার্ভাস ভঙ্গিতে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। ডাক্তার সাহেব এগিয়ে এলেন আমার রুমমেটের দিকে।

জুবায়ের সাহেব, আছেন কেমন?

ভালো।

কী পড়ছেন?

থ্রিলার।

ইন্টারেস্টিং নাকি?

আছে মোটামুটি।

আপনার অপারেশন সিডিউল হয়েছে তো?

জি, কাল।

কী, নার্ভাস?

নাহ্।

দ্যাট্স্ গুড। কখন টাইম দিয়েছে?

সকাল এগারোটা।

আজ বেশি রাত জাগবেন না। শুয়ে পড়বেন।

জুবায়ের সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না।

টেনশন কমাবার জন্য দুটি ট্যাবলেট দিচ্ছি, খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবেন।

ঠিক আছে।

জুবায়ের সাহেব ঘুমুতে গেলেন না। রাত এগারোটা পর্যন্ত নিঃশব্দে থ্রিলার পড়তে লাগলেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম— সিগারেট খেতে চান কি না। নতুন এক প্যাকেট দামি সিগারেট দিয়ে গেছে রহমান, দিনে চারটার বেশি খাব না এই চুক্তিতে। জুবায়ের সাহেব সিগারেটের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন না।

আমি চাদর টেনে ঘুমুতে গেলাম। তখন তিনি ডাকলেন।

ফরিদ সাহেব!

বলুন।

লক্ষ করেছেন, অ্যানি আজ আসে নি ?

জি, লক্ষ করেছি।

আপনার কথাও ঠিক হতে পারে।

কিসের কথা বলছেন ?

ঐ যে বলছিলেন অ্যানি রাগ করেছে, কিন্তু জানতে দেয় নি।

আমি কোনো কথা বললাম না।

কাল আমার অপারেশন, আজ তার আসা উচিত ছিল।

ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল, আসতে পারেন নি।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তো অনেকেই এসেছে। তা ছাড়া সে আসবে গাড়িতে। ঝড়-বৃষ্টিতে তার কী অসুবিধা ?

হয়তো মন-খারাপ হবে বলে আসেন নি, কিংবা হয়তো শরীর খারাপ।

দিন একটা সিগারেট। মন-খারাপের কথা যেটা বললেন সেটাই বোধহয় ঠিক। ওকে আপনার কেমন লাগল ?

ভালো।

শুধু ভালো ?

বেশ ভালো।

ও একটি একসেপশনাল মেয়ে। দূর থেকে এতটা বোঝা যায় না। ভালো করে না মিশলে আপনি বুঝবেন না।

আমি চুপ করে রইলাম। জুবায়ের সাহেব গাঢ় স্বরে বললেন, অ্যানির সঙ্গে পরিচয় হওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার। পরিচয়টা স্থায়ী হলো না।

এখনই এত নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে ?

তিনি থেমে থেমে বললেন, আমি নিজেও একজন ডাক্তার। দিন, আরেকটা সিগারেট দিন।

আমি প্যাকেট বাড়িয়ে দিলাম।

ফরিদ সাহেব!

জি ?

আপনি কি বিয়ে করেছেন ?

না।

বিয়ে করেন নি কেন ?

বিয়ে করার মতো সামর্থ্য কখনো হয় নি।

শুধু এই জন্যেই বিয়ে করলেন না ?

হ্যাঁ, এই জন্যেই।

কোনো মেয়ের সঙ্গে কি কখনো পরিচয় হয়েছে ?

আপনি যে অর্থে বলছেন সেই অর্থে হয় নি।

ভালো লাগে নি কাউকে ?

লেগেছে।

তাদের কাউকে কি তা বলেছেন ?

না, বলা হয় নি।

ফরিদ সাহেব!

জি!

বলেন নি কেন ?

সাহস হয় নি।

pathagar.net

বলা উচিত ছিল। অ্যানিকে কিছু বলার সাহস আমারও ছিল না। আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। আর দেখছেন তো আমাকে, বাঁশগাছের মতো লম্বা। মেডিকেল কলেজে আমার নাম ছিল— বেঙ্গল বেম্বো— বাংলাদেশের বাঁশ। তবু আমি সাহস করে বলেছিলাম।

অ্যানিও কি ডাক্তার ?

হ্যাঁ, সেও ডাক্তার। আমরা এক ইয়ারেই পাস করি।

জুবায়ের সাহেব, ঘুমিয়ে পড়েন।

আজ রাতটা আমি জেগে থাকতে চাই। আজ সারা দিন কী ভেবে রেখেছিলাম জানেন ?

কী ?

অ্যানিকে বলব রাতটা এখানে থেকে যেতে। গল্প করে কাটিয়ে দেয়া যেত। আপনিও গল্প করতেন আমাদের সঙ্গে। অসুবিধা কিছু ছিল না। কী বলেন ?

না, অসুবিধা কী!

ফরিদ সাহেব!

বলেন।

আপনি কি মৃত্যুর কথা ভাবেন ?

হাসপাতালে আসবার আগে ভাবতাম, এখন ভাবি না।

এর কারণ কী, জানেন ?

না, জানি না।

চূড়ান্ত ভয়ের মুখোমুখি হলে এড্রেলিন নামের একটা এনজাইম প্রচুর পরিমাণে আমাদের শরীরে আসে। তখন আর ভয়টয় থাকে না। আপনার রক্তে এখন এড্রেলিন প্রচুর পরিমাণে আছে। কাজেই ভয়টয় লাগছে না। যত দিন যাবে এড্রেলিনের প্রভাব কমে আসতে থাকবে। তখন আবার ভয়। আবার হতাশা।

আমি কিছু বললাম না। কথাটা হয়তো সত্যি। হাসপাতালে আমার খুব একটা খারাপ লাগছে না। এই ক'দিন মৃত্যুর কথা একবারও মনে হয় নি। যা হবার হবে এরকম একটা ভাব চলে এসেছে। নাকি এরকম ভাব আমার মধ্যে সব সময়ই ছিল ?

মনে হয়, ছিল। সংসারে কারো জন্যেই আমার কোনো বিশেষ টান নেই। মা মারা যাবার তিন দিনের দিন আমি স্কুলের অন্যসব ছেলেদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছিলাম। সেখানে মায়ের কথা একবারও মনে হয় নি। আমরা সবাই বোধহয় নিজেদের জন্যেই বাঁচি। জুবায়ের সাহেব যদি সত্যি সত্যি মারা যান, আমার খুব কি খারাপ লাগবে ? সাপের মতো লম্বা ফরসা একটা মানুষ মারা গেলে আমার কী যায় আসে ? শুধু আমার কেন, এ জগতের কারোরই কিছু যায় আসে না। অ্যানি নামের এই চমৎকার মেয়েটি হয়তো কিছুদিনের ভেতরই সুস্থ সবল একটি ছেলেকে বিয়ে করবে। ছুটির দিনে নাটক দেখতে যাবে মহিলা সমিতিতে। ভালোবাসার কথা বলাবলি করবে গভীর রাতে। এদের ঘরে আসবে চমৎকার একজন বাবু। খুব দুষ্টু হবে বাবুটি।

pathagar.net

ভিজিটিং আওয়ার চারটায়। বাবা তিনটার সময় উপস্থিত। গেটে আটকে রেখেছিল, তিনি হৈ-চৈ চেঁচামেচি করে চলে এসেছেন।

কী রে, আছিস কেমন ?

ভালো। চিঠি পেয়েছেন তো ?

হ্যাঁ।

আজই পেয়েছেন ?

হ্যাঁ।

বাবা কী বলবেন তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার ব্যাপারে খোঁজ করবেন, নাকি বাবুলের পাঠানো টাকার পরিমাণটা জিজ্ঞেস করবেন ? কোনটি তাঁর কাছে বেশি জরুরি ? বাবা বললেন, টাকাটা তুলেছিস ?

না। ড্রাফট জমা দিয়েছি, ক্যাশ হতে সময় লাগবে।

কতদিন লাগবে ?

এই ধরেন, দিন সাতেক। কত টাকা সেটা তো জিজ্ঞেস করলেন না ?

কত টাকা ?

লাখখানিক হতে পারে।

বলিস কী!

আরো পাঠাবে। দেখেন, চিঠিটা পড়ে দেখেন।

বাবা চার-পাঁচবার চিঠিটা পড়লেন। এখনো বোধহয় ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমি বললাম, রাজার হালে থাকবেন, এখন চিন্তা নেই কিছু। বাড়ি বানাতে চাইলে বানাতে পারেন। কিংবা টাকাটা ব্যাংকে রেখে তার ইন্টারেস্ট দিয়ে চলতে পারেন। যেটা ভালো মনে করেন।

বাড়ি বানানোই ভালো। একটা স্থায়ী ঠিকানা দরকার। বাবুলও তো দেশে বেড়াতে-টেড়াতে আসবে। উঠবে কোথায় ? ওঠার জায়গা দরকার তো।

তা ঠিক।

আর কিছু থাক আর না থাক, একটা বাড়ি সবার থাকা দরকার। একটা ঠিকানা থাকে। মানুষের একটা ঠিকানা দরকার।

ফিলসফারের মতো কথা বলছেন আমাদের বাবা— ফিলসফার অ্যান্ড ফ্রেন্ড। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। সে মুখে বিস্ময় এবং আনন্দ। যেন চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখছেন। এবং বুঝতে পারছেন এটা স্বপ্ন। যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে যাবে। আমি হালকা স্বরে বললাম, বাবা, অনুকে আপনাদের বাড়িতে এনে রাখবেন। ওর অনেক কষ্ট। বাবা অবাক হয়ে বললেন, ওর আবার কিসের কষ্ট ? টাকা-পয়সা আছে, ঘরবাড়ি আছে। দুইটা নতুন দোকান কিনেছে। উত্তরায় প্লট কিনেছে।

অভাবের কষ্ট ছাড়াও আরো সব কষ্ট আছে বাবা। আমি জানি ও খুব কষ্টে আছে।

তিনি ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

আমি বললাম, বাবা, আপনি কি চা-টা কিছু খাবেন ? ফ্লাস্কে চা আছে।

দে, খাই একটু চা। বড় পরিশ্রম হয়েছে।

শুয়ে থাকবেন ?

নাহ্।

বাবা আগ্রহ নিয়ে চা খেতে লাগলেন। বড় মায়া লাগল। এতটা বয়স হয়েছে তাঁর বোঝাই যায় না।

তোর এখানে আরেকজন থাকে না ?

ওনার আজ সকালে অপারেশন হয়েছে। ভালো আছেন। বেশ ভালো। ডাক্তাররা যা ভেবেছিলেন তা না। ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরবেন।

তোর অপারেশন কবে ?

এখনো ডেট দিতে পারে নি। আরো সপ্তাহখানেক লাগবে বোধহয়। আপনি আর কিছু খাবেন ? এখানে মঞ্জু বলে একজন আছে, তাকে বললেই সে এনে দেবে। খিদে লাগছে ?

হুঁ।

কী খাবেন ? ভালো প্যাটিস আছে। আনাব ?

আনা।

বাবা চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে রইলেন। আমি বললাম, টাকাটা ক্যাশ হলেই করিম সাহেব আমাকে খবর দেবেন। তাঁদের ব্যাংকেই জমা দিয়েছি। করিম সাহেবকে চেনেন তো ? আমার পাশের ঘরে থাকেন।

pathagar.net

চিনি।

অপারেশনে আমার যদি ভালো-মন্দ কিছু হয়ে যায় তাতেও অসুবিধা হবে না। করিম সাহেব ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনার নামে চেক লিখে ওনার কাছে দিয়ে রেখেছি।

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। যেন আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। এমন কোনো রহস্যময় কথা তো আমি বলছি না।

তোর অসুখটা কী ?

আপনি জানেন না ?

না, তুই তো ভালো করে কিছু বলিস নি।

আমার পেটের নালিতে টিউমার হয়েছে। টিউমারটা খারাপ ধরনের হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। পেট না কাটলে ডাক্তাররা বুঝতে পারবেন না।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। থেমে থেমে বললেন, কাল আবার আসব।

দরকার নেই, কেন শুধু শুধু কষ্ট করবেন ?

বাবা অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকালেন। আমি নরম স্বরে বললাম, আমার কোন মাসে জন্ম হয়েছিল আপনার মনে আছে ? ডিসেম্বর না জানুয়ারি ?

কেন ?

না, এমনি। কোনো কারণ-টারণ নেই।

তুই কি কোনো কারণে আমার উপর রাগ করেছিস ?

রাগ করব কেন ?

টাকা চেয়েছিলি, দিই নি।

ছিল না, তাই দেন নি। রাগ করব কেন ?

বাবা অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষীণ স্বরে বললেন, ছিল, আমার কাছে ছিল।

pathagar.net

আমার অপারেশন ডেট দিয়েছে। বুধবার সকাল নটায়। যে প্রফেসর অপারেশন করবেন তিনি একদিন দেখা করতে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, কী ভাই, কেমন আছেন ?

ভালোই আছি।

ভয় লাগছে নাকি ?

জি-না।

দ্যাট্‌স্‌ ভেরি গুড। আচ্ছা, আমি কি আপনাকে ঐ গল্পটা বলেছিলাম, ঐ যে অপারেশন...

জি, এই গল্পটা বলেছেন।

এই দেখেন, একই গল্প আমি দুবার-তিনবার করে বলি। আরেকটা শোনেন, হাতির পেটে অপারেশন হবে। যন্ত্রপাতি সব পেট কেটে ভেতরে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। দুজন নার্সও ঢুকেছে পেটে। ডাক্তার সাহেব অপারেশন শেষ করে স্টিচ করবার পর আঁতকে উঠে বললেন— আরে, নার্স দুজন কোথায় ?

আমি হাসলাম। ডাক্তার সাহেবও প্রাণ খুলে হাসলেন। বেশ লাগল ভদ্রলোককে। আমি বললাম, ডাক্তার সাহেব, আপনি কি সব রোগীর সাথে অপারেশনের আগে দেখা করেন ?

হ্যাঁ, করি।

কেন ?

রোগীরা সাহস পায়। আমি নিজেও কেন জানি সাহস পাই। আসলে আমি একজন ভীতু মানুষ। সার্জারি পড়াটা আমার ঠিক হয় নি।

তিনি আবার ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন। বেশ মানুষ! আমার পাশের বেডের নতুন রোগী বারো-তেরো বছরের একটি বাচ্চা ছেলে। সে ডাক্তার সাহেবের সাথে হাসল। ডাক্তার সাহেব বললেন, তোমার নাম কী খোকা ?

টগর।

টগর আবার কীরকম নাম ?

ফুলের নাম।

ফুলের নাম তো হয় মেয়েদের। বকুল, কদম, পারুল। ফুলের নামে ছেলেদের নাম হওয়া উচিত না। ছেলেদের নাম হওয়া উচিত ফলের নামে, যেমন— আপেল, কলা। হা-হা-হা।

টগর খুব হাসল। এই ছেলেটিও জুবায়ের সাহেবের মতো। হাসে না। কথা বলে না। সব সময় মুখ কালো করে বসে থাকে। আনন্দমেলার পাতা ওল্টায়।

ছেলেটির মা নেই বোধহয়। তার বড় বোন রোজ আসে এবং ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে। চমৎকার একটি দৃশ্য। টগর বড় লজ্জা পায়। আড়চোখে বারবার তাকায় আমার দিকে। আমি ভান করি যেন কিচ্ছু দেখছি না।

রাতেরবেলা সে প্রায়ই ফিসফিস করে আমাকে ডাকে। আমি যদি বলি— কী ? সে সাড়া দেয় না। বড় লাজুক ছেলে।

আমি তাকে জুবায়ের সাহেবের কথা বলি। তিনি কেমন ভয় পেয়েছিলেন। ভোরবেলা যখন তাঁকে নিতে আসে তখন কেমন কাঁদতে শুরু করেন। কিন্তু কী অদ্ভুত ভাবেই না হাসিমুখে ঘরে ফিরে যান। ছেলেটি এই গল্প বারবার শুনতে চায়। এটি এমন গল্প যা কখনো পুরনো হবে না।

টগর চোখ বড় বড় করে বলে, ওনার অসুখ পুরোপুরি সেরে গেছে ?

হ্যাঁ, এবং তোমারও সারবে।

কেমন করে জানেন ?

জানি। জানি।

কেমন করে জানেন, সেটা বলেন।

তা বলব না। এটা গোপন কথা।

সে হাসে। সম্ভবত আমার কথা বিশ্বাস করে। শিশুরা সবকিছুই বিশ্বাস করে।

pathagar.net

অপারেশনের দুদিন আগে বড় ভাই দেখা করতে এলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। হাতে আপেলের একটা প্যাকেট।

কী রে, কেমন আছিস?

ভালো।

এতবড় একটা ব্যাপার, তুই আমাকে মুখের কথাটা বললি না?

বলতে গিয়েছিলাম। আপনাকে পাই নি। চিঠি তো দিয়েছি।

আমার উপর সবার রাগ। এর কারণটা তো আমার জানা দরকার।

রাগ হবে কেন?

বড় ভাই গম্ভীর গলায় বললেন, সংসারের জন্য কি আমি কিছু করি নি? অনুর বিয়ের খরচ কে দিয়েছে?

আপনি দিয়েছেন, আর কে দেবে?

তোর আইএ পরীক্ষার ফিস? কলেজের বেতন? আমি এইসব দিই নি?

হ্যাঁ, দিয়েছেন।

এখনো তো প্রতিমাসের তিন তারিখে বাবা এসে আমার কাছ থেকে একশ' টাকা নিয়ে যান হাতখরচ। নেন না?

এটা আমি জানতাম না। বাবার কথাবার্তায় কখনো প্রকাশ পায় নি। বড় ভাই নিচু স্বরে বললেন, অনেক কিছু আমার করার দরকার ছিল, আমি করতে পারি নি। কিন্তু তোরাও আমার জন্যে কিছু করিস নি।

পুরনো কথা বাদ দেন।

বাদ দেব কেন? তোর ভাবি হাত ভেঙে এক মাস পড়ে রইল হাসপাতালে। কেউ তোরা গিয়েছিলি তাকে দেখতে? স্বীকার করলাম সে ভালো মেয়ে নয়। ঝগড়াটে। কিন্তু মানুষ তো? ডাক্তার বলল, হাত কেটে বাদ দিতে হবে। কী কষ্ট, কী দৌড়াদৌড়ি! কেউ এসেছিলি দেখতে?

হাত কেটে বাদ দিতে হবে এটা শুনি নি।

বড় ভাই আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে শুরু করলেন।

টগর অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখল। তারপর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললাম, ভাবি কেমন আছে? বাচ্চারা?

ভালোই। ওরা সবাই এসেছে। নিচে আছে।

নিচে কেন?

আমি আগে এসেছি তোর সঙ্গে ফয়সালা করতে। কেন এত বড় একটা ব্যাপারে আমি কিছু জানলাম না?

বাদ দেন। আমার ভুল হয়ে গেছে।

ভুলটা কেন করলি সেটা বল? তোকে বলতে হবে।

আমি থেমে থেমে বললাম, কাউকেই কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। আপনি আমার চিঠি কি আজই পেয়েছেন?

না, গত পরশু পেয়েছি। ভাবছিলাম আসব না।

এসে ভালো করেছেন।

আমি এলে না-এলে কারোর কিছু যায় আসে না। আমি আবার কে? তোর এখানে সিগারেট খাওয়া যায়?

যায়। খান। নেন, আমার কাছে ভালো সিগারেট আছে। বাবা এখন বিরাট বড়লোক, শুনেছেন?

হ্যাঁ। তোর চিঠিতে পড়লাম। বাবা আমাকে কিছু বলেন নি।

আপনি দেখে শুনে বাবাকে একটা ছোটখাট বাড়ি বানিয়ে দেন। তাঁর বাড়ির খুব শখ।

আমি কেন? তুই দে।

আমি কিছু বললাম না। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার চোখ মুছতে শুরু করলেন।

আমি কি ভয় পাচ্ছি ?

মনে হয় পাচ্ছি। সারাক্ষণ কেমন এক নতুন ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে শুরু করেছি। যেন সবকিছুই আছে, তবুও কিছুই নেই। স্বপ্ন দেখার মতো ব্যাপার। সবকিছুই ঘটছে। অথচ কিছুই ঘটছে না। মনের ভেতর কোথায় যেন চাপা একটি উত্তেজনাও অনুভব করছি। সেই উত্তেজনাটি কী কারণে তাও স্পষ্ট নয়।

গত রাতে অনেকক্ষণ জেগে থেকে ঘুমুতে গেলাম। ঘুমুবার আগে আগে মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন নার্স এসে বলল, আপনি কি ওষুধ খেয়েছেন ? কোন ওষুধের কথা বলেছে বুঝতে পারলাম না। তবু হাসিমুখে বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, ঘুমিয়ে পড়ুন। জেগে আছেন কেন ? মেয়েটির চেহারা ভালো নয় কিন্তু এমন মিষ্টি গলার স্বর। বারবার শুনতে ইচ্ছে করে।

ঘুম আসতে অনেক দেরি হলো। এবং আশ্চর্য, চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখলাম। কে যেন বলেছিল ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুলে কেউ স্বপ্ন দেখে না। কথাটা সত্যি নয়।

আমি দেখলাম, জেসমিন হাসপাতালে আমাকে দেখতে এসেছে। পিকনিকে যে শাড়ি পরে গিয়েছিল সেই শাড়ি তার গায়ে। গলায় চিকন একটি চেইন। চুল বেণী করে বাঁধা। আমার স্বপ্ন হলো বাস্তবের চেয়েও স্পষ্ট। ঘুমের মধ্যেই আমি তার গায়ের ঘ্রাণ পেলাম। জেসমিন বলল, আপনাকে দেখতে এলাম। অবেলায় ঘুমুচ্ছেন কেন, উঠুন তো! আমি উঠে বসলাম, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটা অন্যরকম হয়ে গেল। দেখলাম হাসপাতাল না, আমি আছি আমার মেসে। জেসমিন চুল আঁচড়াচ্ছে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, তার চুল এখন আর বেণী করা নয়। খুলে দেয়া। সে চুল হাওয়ায় উড়ছে।

স্বপ্নে সবকিছুই খুব স্বাভাবিক মনে হয়। হাসপাতাল থেকে মেসে চলে আসার দৃশ্যটিও আমার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হলো। একবার অবশ্য

pathagar.net

অস্পষ্টভাবে মনে হলো, এটা সত্যি নয়। এটা নিশ্চয়ই স্বপ্ন। হয়তো এক্ষুণি আমার ঘুম ভেঙে যাবে। জেসমিন চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, ইস্, আপার শাড়িটা ছিঁড়ে ফেলেছি। আপা যা রাগ করবে! বলতে বলতে সে হাসল। আমিও হাসতে শুরু করলাম। শাড়ি ছেঁড়ার প্রসঙ্গে দুজনের হাসার ব্যাপারটি মোটেও অস্বাভাবিক বলে মনে হলো না। যেন এটাই স্বাভাবিক। স্বপ্ন কত অর্থহীনই-না হতে পারে!

জেগে উঠে দেখি বালিশ ভিজে গেছে। অর্থহীন হাসাহাসির একটি স্বপ্ন দেখেও খুব কেঁদেছি।

জেসমিন, জেসমিন, তোমার সঙ্গে এ জীবনে বোধহয় আর দেখা হবে না। এ জীবনের পরেও কি অন্য কোনো জীবন আছে ? অনন্ত নক্ষত্রবীথির কোথাও কি আবার দেখব তোমাকে ?

pathagar.net

মাথার উপর উজ্জ্বল আলো। চারদিকে মুখোশ-পরা সব মানুষ। সবাই বড্ড বেশি চুপচাপ। আমার একটু শীত-শীত করছে। কে-একজন আমার নাকের উপর কী একটা চেপে ধরে বললেন, সহজভাবে নিঃশ্বাস নিন। বকুল ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। নেত্রকোনায় আমাদের বাড়ির পাশে বকুলগাছে প্রচুর ফুল ফুটত। সেই বকুলগাছে একবার কে চাকু দিয়ে লিখল— ফরিদ + নীলু। নীলু ফুড কনট্রোলার সাহেবের বড় মেয়ে। বাবা সেই লেখা পড়ে আমাকে উঠোনে চিৎ করে ফেলে পেটে পা দিয়ে চেপে ধরে বললেন, বেশি রস হয়েছে ? গাছে প্রেমপত্র লেখা হচ্ছে ?

নীলু এখন কোথায় আছে ? কত বড় হয়েছে সে ? সে কি দেখতে আগের মতোই আছে, না বদলে গেছে ? সবাই আমরা বদলে যাই কেন ?

আবার কে যেন বললেন, সহজভাবে নিঃশ্বাস নিন। তাঁর কথা অনেক দূর থেকে আসছে। আমি মনে মনে বললাম, আপনারা আমাকে বাঁচিয়ে তুলুন। একটি খুব জরুরি কথা আমার বলা হয় নি। অস্পষ্টভাবে কেউ যেন বলল, কী সেই কথা ? কী কথা সেটা আর মনে পড়ছে না। আমি প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করলাম। বকুল ফুলের গন্ধের সঙ্গে সেই কথা মিশে গেছে। কিছুতেই আলাদা করা যাচ্ছে না। কে যেন গম্ভীর স্বরে বলল, তাড়াতাড়ি মনে করবার চেষ্টা করুন, সময় নেই। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি খুব স্পষ্টভাবে বললাম, আমি সবাইকে ভালোবাসি। এই কথাটি কখনো কাউকে বলা হয় নি। আমাকে বলার সুযোগ দিন, আমার প্রতি দয়া করুন।

ডাক্তারের কথা শুনতে পাচ্ছি। তিনি বলছেন, আপনি বড্ড নড়াচড়া করছেন। সহজভাবে শ্বাস নিন।

আমি শ্বাস নিই। বকুল ফুলের গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।